দাম : বারো টাকা

স্বস্তিকা

বাংলাদেশের জন্ম ও আওয়ামি লিগ-বিরোধী চীন হঠাৎ 'কল্পতরু' হয়ে গেল কেন?
— পৃঃ ২১

চীনপ্রেমিক দালালদের সাহায্যে চীন চাইছে ভারতকে উপনিবেশ করে তুলতে
— পৃঃ ৭

৭২ বর্ষ, ৪০ সংখ্যা।। ২৯ জুন, ২০২০।। ১৪ আষাঢ় - ১৪২৭।। যুগাব্দ ৫১২২।। website : www.eswastika.com

চীনের চালবাজি

প্রস্তুত ভারত

पतंजलि®

प्रकृति का आशीर्वाद

करोड़ों देशवासियों का भरोसेमन्द हर्बल टूथपेस्ट

दन्त कान्ति

दन्त कान्ति के लाभ

- ✓ लौंग, बबूल, नीम, अकरकरा, तोमर, बकुल आदि बेशकीमती जड़ी बूटियों से निर्मित दन्त कान्ति, ताकि आपके दाँतों को मिले लंबी उम्र व असरदार प्राकृतिक सुरक्षा।
- ✓ पायरिया, मसूड़ों की सूजन, दर्द व खून आना, सेंसिटिविटी, दुर्गन्ध एवं दाँतों के पीलेपन आदि को दूर करे।
- ✓ कीटाणुओं से लम्बे समय तक बचाकर दे दाँतों को प्राकृतिक सुरक्षा कवच।

पूरी दुनिया अब नैचुरल प्रोडक्ट्स को अपना रही है
आप भी पतंजलि के नैचुरल प्रोडक्ट्स अपनाइए और प्रकृति का आशीर्वाद पाइए

पढ़ेगा हर बच्चा
बनेगा स्वस्थ और सच्चा
दन्त कान्ति का पूरा प्रॉफिट एजुकेशनल चैरिटी के लिए समर्पित है

आवाहन– राष्ट्र के जागरुक व्यापारियों व ग्राहकों से हम विनम्र आवाहन करते हैं कि करोड़ों देश भक्त भारतीयों की तरह, आप भी पतंजलि के उत्पादों को अपनी दुकानों व दिलों में सर्वोच्च प्राथमिकता देकर जन–जन तक पहुँचाएं और देश की सेवा व समृद्धि में योगदान दें। जिससे महात्मा गाँधी, भगत सिंह व राम प्रसाद बिस्मिल आदि सभी महापुरुषों के स्वदेशी अपनाने के सपने को मिलकर साकार कर सकें।

पतंजलि आयुर्वेद के लगभग 500 उत्पाद है, ये शुद्ध खाद्य उत्पाद व हर्बल सौन्दर्य उत्पाद हमारे पतंजलि स्टोर्स के साथ ओपन मार्केट की दुकानों पर भी उपलब्ध है।

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৭২ বর্ষ ৪০ সংখ্যা, ১৪ আষাঢ়, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ
২৯ জুন - ২০২০, যুগাব্দ - ৫১২২,
Website : www.eswastika.com

সম্পাদক : রন্তিদেব সেনগুপ্ত

সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :
সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪ (W)
সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫
সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪
অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১
অফিস হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৬
বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩
দাম : ১২ টাকা
বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৫০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2019-2021

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫
E-mail : swastika5915@gmail.com
vijoy.adya@gmail.com
Website : www.eswastika.com

ওঁ স্বস্তিক প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে প্রকাশক এবং মুদ্রক সারদা প্রসাদ পাল কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ▯ ৪

কেন্দ্রীয় অনুদান না পাওয়ার অভিযোগ : রাজ্যের সরকারি তহবিল-তছরূপ আড়াল করার প্রয়াস?
▯ দেবযানী ভট্টাচার্য্য ▯ ৫

চীনপ্রেমিক দালালদের সাহায্যে চীন চাইছে ভারতকে উপনিবেশ করে তুলতে ▯ সুজিত রায় ▯ ৭

মানব জাতির স্বার্থে চীনের সঙ্গে লড়াইটা জেতা অত্যন্ত প্রয়োজন ▯ সঞ্জয় সোম ▯ ১০

ভারতের উপর চীনের চাপিয়ে দেওয়া যুদ্ধ
▯ ডা: আর এন দাস ▯ ১২

দেশপ্রেমের হোমানলে চীনের আগ্রাসন প্রতিহত হবেই
▯ ড. পঙ্কজ কুমার রায় ▯ ১৫

ভারতের প্রতি চীনের ঐতিহাসিক শত্রুতা এবং ভারতবাসীর দায়িত্ব ▯ অম্লানকুসুম ঘোষ ▯ ১৬

রক্তাক্ত ভারত ও হানাদার চীন ▯ অনু বর্মণ ▯ ১৯

চীনাপণ্য বয়কট, রবীন্দ্রনাথ ও কিছু প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন
▯ অভিমন্যু গুহ ▯ ২১

বাংলাদেশের জন্ম ও আওয়ামি লিগ-বিরোধী চীন হঠাৎ ‘কল্পতরু’ হয়ে গেল কেন? ▯ ২৩

ভারতের মধ্যে ভারত বিরোধীরা ▯ ড. ডেভিড ফ্রলে ▯ ২৬

পশ্চিমবঙ্গে পরিযায়ী শ্রমিকদের দুরবস্থা
▯ ড. নারায়ণ চক্রবর্তী ▯ ২৮

চিঠিপত্র ▯ ৩০

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

ভারত দুর্বল নহে

ভারতের প্রতিবেশী ভাগ্যটিকে খুব সৌভাগ্য বলা যাইবে না। পশ্চিমে পাকিস্তান এবং পূর্বে চীন—ভারতের এই দুই নিকটতম প্রতিবেশী কখনই ভারতের ঔদার্যে মুগ্ধ হয় নাই। ভারতের সমৃদ্ধি ও উন্নতি বরাবরই তাহাদের ঈর্ষার কারণ হইয়াছে। ভারতের স্বাধীনতা লাভের পর প্রায় সমসময়েই একটি কমিউনিস্ট দেশ হিসাবে বিশ্বের মানচিত্রে চীনের আত্মপ্রকাশ। ওই সময়ে সদ্য স্বাধীন ভারত কিন্তু বিশ্বের অনেক শক্তিধর রাষ্ট্রের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করিয়া কমিউনিস্ট চীনকে স্বীকৃতি দিয়াছিল, তাহার প্রতি বন্ধুত্বের হস্ত প্রসারিত করিয়াছিল। চীন সেই বন্ধুত্বের মর্যাদা দিতে পারে নাই। অচিরেই কমিউনিস্টদের স্বভাব অনুযায়ী চীন তাহার আগ্রাসী মনোভাবের পরিচয় দিতে থাকে। ভারত ভূখণ্ডের কিয়দংশকে নিজেদের ভূখণ্ড বলিয়া দাবি করিতে থাকে। সমস্ত রকম আন্তর্জাতিক রীতিনীতি লঙ্ঘন করিয়া ভারত ভূখণ্ডে চীনা লালফৌজ প্রবেশ করিতে থাকে। ভারত-চীন সীমান্তকে তাহারা পাকাপাকিভাবে একটি উত্তেজনার কেন্দ্র হিসাবে গড়িয়া তোলে। ভারত বরাবরই শান্তির পক্ষে। একদা অতীশ দীপঙ্কর শান্তির বাণীতে চীনের হৃদয় জয় করিয়াছিলেন। ইহাই ভারতের ঐতিহ্য ও পরম্পরা। চীনের প্ররোচনায় সত্ত্বেও ভারত কখনো অন্যায়ভাবে চীনের ভূখণ্ডে অনুপ্রবেশ করে নাই। চীনের ভূখণ্ডকে নিজের ভূখণ্ড বলিয়া দাবিও করে নাই। বরং, ভারত বরাবরই আলোচনার মাধ্যমে সমস্যার সমাধান করিতে চাহিয়াছে। এখনো যুদ্ধ অপেক্ষা আলোচনার পথকেই ভারত সমাধানের শ্রেষ্ঠ উপায় বলিয়া মনে করে। কিন্তু চীন ভারতের এই মনোভাবকেও মর্যাদা দেয় নাই। আলোচনার টেবিল হইতে উঠিয়া গিয়া চীন যথারীতি প্রতিহিংসার পথ অবলম্বন করিয়াছে। চীনের এই মানসিকতার সঙ্গে পাকিস্তানের মানসিকতার অদ্ভুত সাদৃশ্য। অবশ্য ইহা সকলেই জানেন যে, কমিউনিস্টদের সত্যিই মুসলমান জেহাদিদের বিশ্বব্যাপী একটি বন্ধুত্বের সম্পর্ক রহিয়াছে। কাজেই পাকিস্তানও চীনের স্বাভাবিক মিত্র। এই দুই স্বাভাবিক মিত্র হাত মিলাইয়া ভারতের ক্ষতিসাধন করিতে সর্বদাই ব্যস্ত।

বিদেশনীতির কারণে ভারত চীনের সম্মুখে কার্যত অসহায় আত্মসমর্পণ করিয়াছিল। নেহরু বলিয়াছিলেন, আকসাই চীনে এক খণ্ড তৃণও জন্মায় না। অতএব উহা চীনের দখলে গেলে কোনো ক্ষতি নাই। এতখানি অপরিণামদর্শী ছিল নেহরুর চিন্তাধারা। বস্তুত কেন্দ্রে যতদিন কংগ্রেস সরকার ছিল, ততদিন চীনের বিরুদ্ধে কোনোরূপ কঠোর মনোভাব ভারত প্রদর্শন করিতে পারে নাই। তদুপরি সোনিয়া গান্ধী পরিচালিত রাজীব গান্ধী ফাউন্ডেশনে চীনা সরকার অর্থ সাহায্য করিয়া কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের মুখ বন্ধ করিয়া দিয়াছে। কিন্তু নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন সরকার ক্ষমতায় আসিবার পর পরই দেশের বিদেশনীতিতে কিছু উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আসিয়াছে। নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে ভারত এখন বিশ্ব দরবারে সম্ভ্রম আদায় করিয়াছে । সম্প্রতি রাষ্ট্রসঙ্ঘের নিরাপত্তা পরিষদে সদস্য পদও লাভ করিয়াছে নরেন্দ্র মোদীর ভারত। এইসবই চীনের ঈর্ষার কারণ হইয়াছে। চীনা লালফৌজ সীমান্ত লঙ্ঘন করিয়া ভারত ভূখণ্ডে প্রবেশ করিয়া কুড়িজন ভারতীয় জওয়ানকে হত্যা করিলে ভারতীয় বীর জওয়ানরা তাহার যথাযোগ্য প্রত্যুত্তর দিয়াছে। চীনেরও প্রায় পঞ্চাশজন সৈন্যকে প্রাণ দিতে হইয়াছে। নরেন্দ্র মোদীর ভারত ইহা বুঝাইয়া দিয়াছে, ভারত শান্তির নীতিতে বিশ্বাসী হইলেও, আঘাত আসিলে প্রত্যাঘাত করিতেও সে জানে। ভারতের শান্তির বাণী যে অসহায়ের কাতর আত্মসমর্পণ নয়, বরং শক্তিধরের দয়াপ্রদর্শন নরেন্দ্র মোদীর ভারত সেই বার্তা কমিউনিস্ট চীনকে সঠিকভাবেই দিয়াছে।

সুভাষিতম্

মনসা চিন্তিতং কার্যং বাচা নৈব প্রকাশয়েৎ।

মন্ত্রেন রক্ষয়েদ্ গূঢ়ং কার্য চাপি নিযোজয়েৎ।। (চাণক্য নীতি)

মনে মনে ভাবা কাজের কথা মুখ থেকে বের করা উচিত নয়। মন্ত্রের মতো তা রক্ষা করতে হবে। গুপ্ত রেখেই তাকে কার্যে পরিণত করতে হবে।

কেন্দ্রীয় অনুদান না পাওয়ার অভিযোগ

রাজ্যের সরকারি তহবিল-তছরূপ আড়াল করার প্রয়াস?

দেবযানী ভট্টাচার্য্য

করোনা মহামারীর প্রকোপে থমকে যাওয়া দেশের গ্রামীণ অর্থনীতি যাতে কিঞ্চিৎ গতি লাভ করতে পারে, তার জন্য ভারতের পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী গত ১৭ জুন ভারতের ২৮টি রাজ্যের গ্রামীণ লোকাল বডি অর্থাৎ পঞ্চায়েতগুলির জন্য মোট ১৫,১৭৭.৫০ কোটি টাকার অনুদান মঞ্জুর করেছে ভারতের অর্থমন্ত্রক। এ বিষয়ে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রকের ব্যয়দপ্তর বা ডিপার্টমেন্ট অব এক্সপেনডিচারের তরফ থেকে জানানো হয়েছে যে, সংশ্লিষ্ট রাজ্যগুলির অর্থদপ্তরের কাছে অনুদানের অর্থমূল্য পৌঁছনোর সর্বাধিক ১০ দিনের মধ্যে যেন রাজ্যের গ্রামীণ লোকাল বডি বা পঞ্চায়েতগুলির কাছে সেই টাকা পৌঁছে যায়। টাকা পৌঁছতে ১০ দিনের বেশি দেরি হলে রাজ্যকে উক্ত বিলম্বিত সময়ের সুদসহ পঞ্চায়েতগুলিকে দিতে হবে বলে জানিয়েছে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রকের ব্যয়দপ্তর।

প্রশ্ন উঠতে পারে , রাজ্যের অ্যাকাউন্ট থেকে পঞ্চায়েতগুলিকে টাকা পাঠানোর জন্য ১০ দিনের সময় বেঁধে দেওয়ার কী প্রয়োজন ছিল কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রকের? উত্তর সম্ভবত এই যে, কোনো রাজ্য যাতে অনুদানের অর্থ রাজ্যের অ্যাকাউন্টে ফেলে রেখে সুদ সংগ্রহ না করে গ্রামীণ এলাকাগুলির পঞ্চায়েতের হাতে যথাশীঘ্র তুলে দেয়, সেই উদ্দেশ্যেই এমত নির্দেশিকা বলে অনুমান করা যায়।

১৭ জুন অর্থমন্ত্রকের নোটিফিকেশনের ১ নং অ্যানেক্সার অনুযায়ী উপরোক্ত খাতে অনুদান বাবদ পশ্চিমবঙ্গ পাচ্ছে ১১০৩ কোটি টাকা। করোনা ও আমফান বিধ্বস্ত পঞ্চায়েতগুলির হাতে এই অর্থ পৌঁছলে পশ্চিমবঙ্গের গ্রামীণ অর্থনীতির নিশ্চিতভাবেই কিঞ্চিৎ সুরাহা হওয়ার কথা। কিন্তু রাজ্য যদি যথাসময়ে এই অর্থ পঞ্চায়েতগুলির হাতে তুলে না দিয়ে এই অর্থ অন্য খাতে ব্যয় করে অথবা কোনো খাতেই ব্যয় না করে রাজ্যের অ্যাকাউন্টে ফেলে রাখে, তবে গ্রামীণ লোকাল বডিগুলি এই অনুদানের আর্থিক লাভ পাবে না। এটি ঠেকানোর জন্যই সম্ভবত কেন্দ্রীয় ব্যয়দপ্তরের নির্দেশিকায় ১০ দিনের মধ্যে অর্থ বিতরণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কেন্দ্রীয় অর্থদপ্তর এও জানিয়েছে যে, পঞ্চায়েতগুলির নিজস্ব অ্যাস্টাব্লিসমেন্ট কস্ট ও কর্মচারীদের বেতন খাত বাদ দিয়ে এই মৌলিক অনুদান গ্রামীণ এলাকার অঞ্চলভিত্তিক নানা স্থানীয় প্রয়োজন মেটানোর জন্য ব্যয় হতে হবে।

অনুদানের খরচ সংক্রান্ত নির্দেশিকায় কিছু শর্তাবলী যেহেতু কেন্দ্র রেখেছে, সেহেতু একথা অনুমান করা যায় যে, অনুদান-মূল্যের যথাযথ ব্যবহার এবং তার পূর্ণ হিসাব পরবর্তীতে কেন্দ্রের কাছে পেশ করা ওই ২৮টি রাজ্যের কর্তব্যের মধ্যে পড়বে। ১৭ জুন রিলিজ করা হয়েছে রুরাল লোকাল বডি বেসিক অনুদানের প্রথম ইনস্টলমেন্ট। অনুদানের দ্বিতীয় ইনস্টলমেন্ট কেন্দ্রের কাছ থেকে আশা করার আগে, প্রথম ইনস্টলমেন্টের ব্যবহার ও তার যথাযথ হিসাব কেন্দ্রের কাছে পেশ না করলে পরবর্তী ইনস্টলমেন্ট পেতে রাজ্যগুলির অসুবিধা হওয়া স্বাভাবিক।

পশ্চিমবঙ্গের অর্থমন্ত্রী অমিত মিত্র তাঁর বাজেট বক্তৃতায় এবং তৎপরবর্তীকালেও অজস্রবার সংবাদমাধ্যমের সামনে অভিযোগ করেছেন যে, কেন্দ্রীয় সরকার প্রাপ্য টাকা রাজ্যকে দিচ্ছে না। ড. মিত্রের মতো বিদগ্ধ ব্যক্তির মুখ থেকে বার বার এমত অভিযোগ শুনলে রাজ্যের সাধারণ মানুষের মনে হতে পারে যে, ভারত সরকার বুঝি সত্যই বিমাতৃসুলভ আচরণ করছে আমাদের রাজ্যটির প্রতি। কিন্তু বাস্তব পরিস্থিতি কি সত্যই তাই? আমাদের দেশ একটি ওয়েলফেয়ার স্টেট। অর্থাৎ অনুদান জনকল্যাণমূলক কাজে ব্যয়িত হওয়ার কথা। দেশের প্রতিটি রাজ্যে জনকল্যাণের দায়িত্ব রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকার উভয়েরই। কেন্দ্র ও রাজ্যের সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা হলো এ বিষয়ে পরস্পরের প্রতি সহযোগিতামূলক মনোভাব বজায় রেখে ফেডেরেলিসমের নীতি মেনে চলা। কিন্তু রাজ্য যদি কেন্দ্রীয় অনুদানের ব্যয় বিষয়ক কেন্দ্রীয় নির্দেশিকা মেনে না চলে এবং তার হিসাব পুস্তিকা যথাসময়ে কেন্দ্রের কাছে পেশ না করে, তাহলে পরবর্তী কেন্দ্রীয় অনুদান পেতে তার অসুবিধা হওয়া অস্বাভাবিকও নয়, অনুচিতও নয়। ১৭ জুন রুরাল লোকাল বডি বেসিক অনুদানের প্রথম ইনস্টলমেন্ট বাবদ ১১০৩.০০ কোটি টাকা পশ্চিমবঙ্গ পাচ্ছে। এই অনুদানের দ্বিতীয় ইনস্টলমেন্ট পেতে হলে রাজ্যকে এর হিসাব দিতে হবে।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, সর্বপ্রকার সরকারি কাজকর্ম আদতে হয় আমলাতন্ত্রের মাধ্যমে। মন্ত্রী তথা এক্সিকিউটিভ দায়িত্বপ্রাপ্ত জনপ্রতিনিধিরা সিদ্ধান্ত নিলেও সে সিদ্ধান্তের রূপায়ণ হয় আমলাদের দ্বারা। কোনো খাতে কোনো অর্থ বরাদ্দ করতে হলে বা অনুরূপ যে কোনো রকম সরকারি পদক্ষেপ নিতে গেলে আমলাদের হাতে যে সকল প্রয়োজনীয় সহায়ক ডকুমেন্টস থাকা দরকার, তার সব কটি সন্তোষজনকভাবে না থাকলে অর্থ বরাদ্দের কাজ বা অন্য যে কোনো রকম সরকারি ক্লিয়ারেন্স দিতে তাঁরা অপারগ থাকেন কারণ এই সব কাজের আইনগত উত্তরদায়িত্ব থাকে আমলাদের। সরকারি সিস্টেম এমনই যে প্রয়োজনীয় ডকুমেন্টস ছাড়া কোনো কাজ করার ঝুঁকি নিয়ে নিজেদের আইনত বিপদে ফেলা আমলাদের পক্ষে অসম্ভব। এই ব্যবস্থাটিকেই সাধারণ ভাষায় বলা হয়ে থাকে আইনের শাসন। সরকারি অর্থের যথেচ্ছ ব্যবহার করার অধিকার বা ক্ষমতা আইনত কাউকেই দেওয়া নেই। প্রত্যেককেই সাংবিধানিক ও আইনগত সীমাবদ্ধতার মধ্যে থেকে কাজ করতে হয়। এহেন পরিস্থিতিতে পূর্ববর্তী সমস্ত কেন্দ্রীয় অনুদানের যথাযথ হিসাব পশ্চিমবঙ্গ পেশ করেছে কি না, তা না জানলে পশ্চিমবঙ্গের অর্থমন্ত্রী অমিত মিত্রের অভিযোগের সত্যতা প্রমাণিত হয় না। কেন পশ্চিমবঙ্গের প্রাপ্য প্রায় ৯০.০০০ কোটি টাকা (ড. অমিত মিত্রের বক্তব্য অনুযায়ী) কেন্দ্রীয় সরকার আটকে রেখেছে, তা জানার

অধিকার প্রতি পশ্চিমবঙ্গবাসীর আছে। সেই সঙ্গে এ প্রশ্ন করার অধিকারও পশ্চিমবঙ্গবাসীর আছে যে সমস্ত কেন্দ্রীয় অনুদানের খরচের যথাযথ হিসাব পুস্তিকা পশ্চিমবঙ্গ সরকার ভারত সরকারের কাছে পেশ করেছে কি না? এ প্রশ্ন করার অধিকার এ রাজ্যের মানুষের এই কারণে রয়েছে যে, রাজ্য যদি তার প্রাপ্য পাওনা থেকে বঞ্চিত হয় শুধুমাত্র এমত হিসাব পেশ না করার ফলে, তবে সে বঞ্চনা রাজ্যের মানুষের ভাগ্যে বর্তায়। অর্থাৎ রাজ্যের পাবলিক সার্ভেন্ট আমলারা তাঁদের কর্তব্য কর্ম যথাযথভাবে পালন করে কেন্দ্রীয় অনুদানের হিসাবপত্র ভারত সরকারের কাছে না পাঠানোর কুফল ভোগ করতে হচ্ছে রাজ্যের সাধারণ মানুষকে। তাঁরা বঞ্চিত থেকে যাচ্ছেন রাষ্ট্রীয় অনুদান থেকে। কিন্তু একথাও অবশ্য উল্লেখ্য যে, কর্তব্যে অবহেলা এ রাজ্যের আমলারা নিজ সিদ্ধান্তে করছেন না। রাজ্যের অর্থমন্ত্রী অমিত মিত্র বার বার অভিযোগ করেছেন যে, রাজ্যের প্রাপ্য টাকা কেন্দ্র রাজ্যকে দিচ্ছে না। কিন্তু একথা ড. মিত্র একবারও দাবি করেননি যে পূর্ববর্তী সমস্ত কেন্দ্রীয় অনুদানের হিসাবপুস্তিকা রাজ্যের তরফ থেকে ভারত সরকারের হাতে তুলে দেওয়া সত্ত্বেও ভারত সরকার পশ্চিমবঙ্গের প্রাপ্য টাকা আটকে রেখেছে। বরং এ বিষয়ে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর কথা স্মরণীয়। ২০১৮ সালের ডিসেম্বর মাসে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার প্রশাসনিক পর্যালোচনা বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের আমলাদের সুপারিশ করেছিলেন যে রাজ্যের কোনো তথ্য যেন কেন্দ্রকে জানানো না হয়। পশ্চিমবঙ্গের সংবাদমাধ্যমগুলি এমত সংবাদ পরিবেশনও করেছে। আনন্দবাজার পত্রিকার রিপোর্ট অনুযায়ী— ''কেন্দ্রের সঙ্গে কার্যত পূর্ণ অসহযোগিতার পথ নিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কেন্দ্রের বিরুদ্ধে 'অসত্য প্রচারে'র অভিযোগ তুলে নবান্নকে দিল্লির সঙ্গে সংঘাতে যাওয়ার সংকেত দিলেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ, রাজ্য সরকারের প্রকল্প সম্পর্কিত কোনও তথ্য এবার থেকে কেন্দ্রীয় সরকারকে পাঠানো হবে না।" —অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গের পাবলিক সার্ভেন্ট আমলারা রাজ্যের তথ্য ও হিসাব কেন্দ্রের কাছে যথাসময়ে পেশ করে তাঁদের দায়িত্ব পালন করতে পারছেন না রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তথা মুখ্য জনপ্রতিনিধির সুপারিশ অনুযায়ী। তার ফল ভোগ করতে হচ্ছে রাজ্যের সাধারণ মানুষকে। কারণ তাঁরা বঞ্চিত হচ্ছেন কেন্দ্রীয় অনুদান থেকে। এমতাবস্থায় গণতন্ত্রের নিয়ম অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গের মানুষকেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে, এমন ব্যক্তিকে মুখ্য জনপ্রতিনিধি হিসেবে তাঁরা আর নির্বাচন করবেন কী না।

এই পরিপ্রেক্ষিতে আরও যে সঙ্গত প্রশ্নটি উঠে আসে তা হলো , রাজ্য যদি তার তথ্য কেন্দ্রের কাছে পরিবেশন না করে অর্থাৎ কেন্দ্রীয় অনুদানের হিসাব এবং রাজ্যের জনসম্পদ সংক্রান্ত তথ্য যদি ভারত সরকার জানতে না পারে, তবে পরবর্তী অনুদান কেন্দ্র পাঠাবে কীসের ভিত্তিতে? রাজ্যের জন্য বরাদ্দ কেন্দ্রীয় অনুদানের ক্লিয়ারেন্সের জন্য রাজ্যের অর্থমন্ত্রীর মৌখিক দাবি বা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর দিল্লিতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী বা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে দরবার করা নিঃসন্দেহে যথেষ্ট নয়, কারণ ইতিপূর্বেই উল্লেখ করেছি যে সর্বপ্রকার সহায়ক তথ্য ব্যতীত আমলাতন্ত্রের পক্ষে কোনো ক্লিয়ারেন্স দেওয়া আইনত সম্ভব নয়।

এ বিষয়ে আরও উল্লেখ্য যে, ২০১৮ সালের অক্টোবর মাসে পশ্চিমবঙ্গের ওয়েলফেয়ার স্কিমগুলির প্রসেস অডিট করতে চেয়েছিল কম্পট্রোলার অ্যান্ড অডিটর জেনারেল অব ইন্ডিয়া। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের অর্থদপ্তর এ বিষয়ে সিএজি-র সঙ্গে সহযোগিতা করতে রাজি না হওয়ায় প্রসেস অডিট করতে ব্যর্থ হয় সিএজি। এই ঘটনাও এ প্রশ্নের জন্ম অবশ্যই দেয় যে, যে কেন্দ্রীয় প্রকল্পগুলির বকেয়া অর্থ না পাওয়ার অভিযোগ রাজ্যের অর্থমন্ত্রী বারবার তুলছেন, সেই কেন্দ্রীয় প্রকল্পগুলিরই প্রসেস অডিটে বাধা সৃষ্টি কেন করল পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অর্থ দপ্তর? বরং প্রসেস অডিটের মাধ্যমে ওই প্রকল্পগুলির হিসেব-নিকেশ সংক্রান্ত সমস্ত জটিলতার নিবৃত্তি করার সুযোগ ছিল, যার মাধ্যমে রাজ্যের বকেয়া সব অনুদান মঞ্জুর হয়ে যেতে পারত। কিন্তু প্রসেস অডিট আটকে দিয়ে সে পথ বন্ধ করল রাজ্য সরকার নিজেই। প্রশ্ন হলো, তবে কি পশ্চিমবঙ্গ সরকার কেন্দ্রীয় জকল্যাণমূলক প্রকল্পগুলির অনুদান তহবিল তছরূপ করতে অভ্যস্ত এবং পশ্চিমবঙ্গের অর্থ দপ্তর কি সেই তছরূপে সরাসরি জড়িত? সিএজি প্রসেস অডিটে সেই তছরূপ ধরা পড়ে যাওয়ার ভয়েই কি রাজ্য আটকে দিল প্রসেস অডিট? তবে কি কেন্দ্রীয় প্রকল্পের টাকা ক্লাব, ইমাম, মোয়াজ্জিনভাতা দেওয়া, পুজোর চাঁদা দেওয়া, মেলা, খেলা উৎসবের নামে নয়-ছয় করছে পশ্চিমবঙ্গ সরকার? সিগনেটরি অথরিটি হিসেবে কে আছেন এই নয়ছয়ের পিছনে? কেই-বা এসবের আইনসঙ্গত মাথা? নয়-ছয় যদি কোনো মন্ত্রীর সুপারিশেও হয়, তাহলেও আইনত তার জন্য দায়ী থাকার কথা কোনো না কোনো আমলার। তবে কি অর্থ দপ্তরের আমলারা জড়িয়ে আছেন সরকারি তহবিল তছরূপের সঙ্গে?

এ বিষয়ে আরও উল্লেখ্য যে, সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল জগদীপ ধনকড় অভিযোগ তুলেছেন যে, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আবগারি দপ্তর সরকারি ক্ষমতার অপব্যবহার করে অপদস্থ করছে কোনো এক বিশেষ কোম্পানিকে যে কোম্পানি আইন মেনে চলে এবং সেই বিষয়ে টেন্ডার সংক্রান্ত গভীর দুর্নীতি ও ফেবারিটিজমের অভিযোগও রাজ্যপাল তুলেছেন। তিনি এও বলেছেন যে, পাবলিক সার্ভেন্টরা এই ধরনের দুর্নীতিতে জড়িয়ে পড়লে আইনের হাতুড়ির আঘাত তাঁদের মাথায় এসে পড়বেই। রাজ্যপালের এমত অভিযোগ থেকেও আভাস পাওয়া যায় যে, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আবগারি দপ্তরের (যা অর্থদপ্তরের অধীনে) আমলারাও সম্ভবত রাজ্যের আর্থিক দুর্নীতি ও তহবিল তছরূপের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। রাজ্যপালের এমত অভিযোগ আমার ব্যক্তিগত কিছু পর্যবেক্ষণের সঙ্গেও সাযুজ্যপূর্ণ। পশ্চিমবঙ্গে মদের ব্যবসার লাইসেন্স এক বিশেষ শ্রেণীর মানুষ ছাড়া অন্য কাউকে দেওয়া হচ্ছিল না, এমন অভিযোগ এ রাজ্যে উঠেছিল ২০১৮ সালেই।

পরিশেষে বলা প্রয়োজন যে, কেন্দ্র-রাজ্য এই দ্বৈরথের অবতারণা কেবলমাত্র বৃথা রাজনীতি। হয়তো এ জাতীয় বৃথা রাজনীতর আদত কারণ দুর্নীতি চাপা দেওয়া, কিন্তু কারণ যাই হোক, এই দ্বৈরথ ওয়েলফেয়ার স্টেটের মূল উদ্দেশ্যটিকে ব্যর্থ করছে। অন্য কেউ নয়, বঞ্চিত হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গের মানুষ। তাই পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উচিত প্রয়োজনীয় সমস্ত তথ্য ভারত সরকারকে সরবরাহ করা যাতে পশ্চিমবঙ্গের জনগণ তার ন্যায্য পাওনা রাষ্ট্রীয় অনুদান যথাসময়ে যথা পরিমাণে পেতে পারে। ১৭ জুন যে পঞ্চায়েত অনুদানের প্রথম ইনস্টলমেন্ট রাজ্যের জন্য বরাদ্দ হলো, সেই অনুদানের পরবর্তী ইনস্টলমেন্টগুলি পেতে রাজ্যের যেন কোনো অসুবিধা না হয় তা দেখা রাজ্যেরই দায়িত্ব। কেন্দ্রকে দোষারোপ করে সে দায়িত্ব থেকে মুক্ত হতে পশ্চিমবঙ্গ সরকার পারবে না। ■

প্রচ্ছদ নিবন্ধ

চীনপ্রেমিক দালালদের সাহায্যে চীন চাইছে ভারতকে উপনিবেশ করে তুলতে

জওহরলাল নেহরু এখন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নন। চীনকে মনে করিয়ে দেওয়া দরকার— শুধু ভারতে নয়, গোটা পৃথিবীতেই তোমাদের প্রেমিকরা প্রায় নিশ্চিহ্ন। এ ভারত অন্য ভারত। এ ভারত নয়া ভারত। এ ভারতে পা রাখলে আমাদের চেয়ে অনেক বেশি রক্ত ঝরবে তোমাদের।

bangla.ganashakti.co.in

সীমান্তে সংঘাত,

● প্রথম পৃষ্ঠার পর

করেছিল, সীমান্তে উত্তেজনা প্রশমনে গুরুত্বপূর্ণ সহমতেও পৌঁছেছিল। কিন্তু বিস্ময়করভাবে ১৫ জুন ভারতীয় সেনারা সেই সহমত গুরুতরভাবে লঙ্ঘন করে। এবং দু'বার অবৈধ কাজ করতে চীনের সীমান্ত অতিক্রম করে। তারা চীনের জওয়ানদের প্ররোচনা দেয় ও আক্রমণ করে। তা থেকে দু'দেশের সেনাদের মধ্যে গুরুতর শারীরিক সংঘর্ষ ঘটেছে। চীন এই ঘটনার জোরালো প্রতিবাদ জানিয়েছে ভারতের কাছে। ঝাও বলেন, আমরা পুনরায় ভারতকে অনুরোধ করছি সহমত মেনে চলার জন্য। তাদের সীমান্তে থাকা সেনাদের কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য যাতে তারা সীমান্ত অতিক্রম না করে। তারা যেন কোনও সমস্যা তৈরি না করে, একতরফা এমন কোনও পদক্ষেপ না নেয় যাতে ঘটনা জটিল হয়ে ওঠে। উভয় পক্ষই আলোচনার মাধ্যমে এই সমস্যার সমাধানে ও উত্তেজনা হ্রাসে একমত হয়েছে। সীমান্তে শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখতে দু'দেশই একমত।

সম্প্রতি গালওয়ানে চীন-ভারতের সেনার সংঘর্ষ নিয়ে সিপিএমের মুখপত্র গণশক্তি পরিবেশিত সংবাদ।

সুজিত রায়

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'দুই বিঘা জমি' কবিতায় জমিদার গরিব প্রজা উপেনের জমি 'মিথ্যা দেনার দায়ে' ডিক্রি জারি করে কেড়ে নিয়েছিলেন। সেটা ছিল সেকালের বাস্তব পটভূমির সাহিত্যচিত্র।

অনেক পরে ভূমিসংস্কারের নামে যুক্তফ্রন্টের আমলে জমিদারদের জমি কেড়ে নেওয়া শুরু হয়েছিল। অনেক জমিদার-জোতদারের মুণ্ডু কাটা গিয়েছিল নকশাল আমলেও।

আরও পরে বামফ্রন্টের মধ্যগগণে এই পশ্চিমবঙ্গেই শুরু হয়েছিল সিন্ডিকেট রাজ। জমি আপনার। আপনার কেনা জমিতে আপনাকেই দখল দেবেন নেতারা। পয়সার বিনিময়ে। তারপর যখন আপনি সেই জমিতেই মাথা গোঁজার ঠাঁই গড়তে চাইবেন, তখনও সিন্ডিকেট বলে দেবে ইঁট, বালি, পাথর, সিমেন্ট গুণগতমানে কম, দামে বেশি হলেও তাদের কাছ থেকেই নিতে হবে।

তৃণমূল আমলে সেই সিন্ডিকেট রাজ চলে গেল শিল্পের পর্যায়ে। অর্থাৎ সাধারণ মানুষকে কোতল করার অস্ত্রটা তো বহাল রইলই। এবার কোটা শুরু হলো বড়ো বড়ো ব্যবসায়ী শিল্পপতিদের নয়া উদ্যোগে। কারণ সেখানে সিন্ডিকেট কামাতে পারছে এক লপ্তে মোটা দাঁও। ফলে বহু শিল্পপতিই পাততাড়ি গোটালেন এই রাজ্য থেকে। এসবই ওই 'দুই বিঘা জমি'-রই আধুনিক সংস্করণ। উপেনের রাজাও ছিলেন জমিচোর। এ যুগের রাজনীতিবিদরাও জমিচোর এবং তা ঘটে চলেছে অবাধে, প্রকাশ্য দিবালোকে।

পশ্চিমবঙ্গ-সহ ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে জমি চোরদের এইসব ক্ষুদ্র সংস্করণেরই বৃহত্তর সংস্করণ চীন। যুক্তফ্রন্ট, বামফ্রন্ট, তৃণমূলিদের কারবার দু-চার বিঘা নিয়ে। আর ১৩০ কোটি পীতবাসীর দেশ চীন হলো সেরার সেরা জমিচোর। ভারতের বিস্তীর্ণ চীন সীমান্তে তারা সেই ১৯৫০-৫১ সাল থেকেই চুরি করে চলেছে লক্ষ লক্ষ একর জমি এবং সিংহভাগই ভারতের। কিছুটা নেপাল বা ভুটানেরও। এবং সবটাই গায়ের জোরে। বহু আগেই ১৯৫০ সালে চীন গায়ের জোরে, রাজনৈতিক কৌশলে এবং নির্মম অত্যাচারের নজির রেখে দখল করে নিয়েছিল গোটা তিব্বতকেই। আর এখন নজর নেপাল, ভুটান ও ভারত। তাই ভারত স্বাধীন হবার পর থেকেই তাদের পাখির চোখ ভারত, যে ভারত কে তারা চীনা উপনিবেশ বানাতে চায়। মূল লক্ষ্য গোটা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় জমিদারির পত্তন করা এবং ভারতের মতো ভূমিখণ্ডের বিশাল মানবশক্তিকে অমানবিক পাশবিকতার শিকার করে তুলে ভারতবর্ষের যে বিশাল খনিজ ও প্রাকৃতিক সম্পদ তা দখল করে বিশ্ব-বাজারের মালিক হয়ে বসা।

এ পরিকল্পনা নতুন কিছু নয়। ১৯৪৬ সাল থেকে চীনা কমিউনিস্ট রেভেলিউশনের নামে গৃহযুদ্ধের বীভৎসতার মাধ্যমে ১৯৫০ সালে পিপলস রিপাবলিক অব চায়না প্রতিষ্ঠার পর থেকে চীনের শ্যেনচক্ষু পড়েছিল ভারতবর্ষের ওপর যার পরিণতি ১৯৬২ সালের চীনের অতর্কিত ভারত আক্রমণ এবং আকসাই চীন-সহ লাদাখের বিস্তীর্ণ অঞ্চল পাকিস্তানের কাছ থেকে উপঢৌকন হিসেবে দখল করে নেওয়া। যা

আদতে পাকিস্তানও দখল করেছিল গায়ের জোরেই। কাশ্মীর থেকে নির্বাসিত ইউনাইটেড কাশ্মীর পিপলস ন্যাশনাল পার্টির নেতা সর্দার সৌকত আলি কাশ্মীরি ইউরোপে বসে সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছিলেন— "...The current standoff and escalating tension between Indian and chinese troops in Eastern Ladak at the line of Actual Control is very sencitive and dangerous to peace and security in the region."

আজ সেটাই হচ্ছে। সিকিম, অরুণাচল, কাশ্মীর, উত্তরাখণ্ড এমনকী নেপাল এবং ভুটানের বহু চীন লাগোয়া সীমান্ত অঞ্চল জুড়ে আন্তর্জাতিক মানের সন্ত্রাস চালাচ্ছে চীন। ভারত ও চীনের ৪০৫৬ কিলোমিটার সীমান্ত অঞ্চলকে চীন তাদের অধিকারে বলে দাবি তুলেছিল। ১৯৬২-র যুদ্ধের পর আন্তর্জাতিক স্তরের সমঝোতার মাধ্যমে তা ২০০০ কিলোমিটারে নেমে এসেছে। কিন্তু আগ্রাসন বন্ধ হয়নি।

প্রশ্ন উঠেছে, যদি ১৯৫০ সাল থেকেই চীনা অনুপ্রবেশের ঘটনা ঘটে থাকে এবং মাইলের পর মাইল ভারতীয় জমি চীন চুরি করে নেয় তাহলে কেন্দ্রীয় সরকার এবং প্রতিরক্ষা দপ্তর কী করছিল? সঠিক প্রশ্ন। উত্তর হিসেবে একটা উদাহরণ দেওয়া যাক। ২০১০ থেকে ২০১৩ সাল, কেন্দ্রে তখন দ্বিতীয় ইউপিএ সরকার। পূর্ব লাদাখ সীমান্তে চীনা অনুপ্রবেশ চলছে ঘন ঘন। মাইলের পর মাইল দখল হয়ে যাচ্ছে। চার বছরেই দখল ৬৪০ বর্গ কিলোমিটার। নজরেই ছিল না কারও। ২০১৩ সালে ভারতের প্রাক্তন পররাষ্ট্র সচিব এবং তৎকালীন ন্যাশনাল সিকিউরিটি অ্যাডভাইসরি বোর্ডের চেয়ারম্যান শ্যামসরণ বিষয়টি জানতে পেরে কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা দপ্তরের নজরে আনেন। তখনই খোঁজখবর শুরু হয়ে যায়। জানা যায়, ওই সময়ের মধ্যে চীন ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে ৬০০ বার অনুপ্রবেশ করেছে। সংঘাত হয়েছে কিনা বা কত সেনার মৃত্যু হয়েছে তা কোনোদিনই প্রকাশ্যে আসেনি। (Ref. Kashmir Observer May, 28, 2020)

প্রশ্নটা এখানেই— জওহরলাল নেহরু থেকে শুরু করে মনমোহন সিংহ, সোনিয়া গান্ধী, রাহুল গান্ধীরা অবাধে চীনকে ভারতীয় ভূখণ্ড উপঢৌকন দিয়ে চলেছেন। আকসাই চীন থেকে পূর্ব লাদাখের বিস্তীর্ণ অঞ্চল। শুধু লাদাখ নয়, সিকিমের ডোকোলাম, লে-র দেসোচোক, সুমার, হিমাচল প্রদেশের কিন্নৌর অঞ্চলের কাউরিক, শিপকিলা, নেলাং, জুলম সুন্দা, উত্তরাখণ্ডের উত্তরকাশীর জাদং ও লাপথাল, যামোলির বারাহোতি, অরুণাচলের তাওয়াং, সিয়াচেনের বিভিন্ন অঞ্চল, (নেপালের কালাপানি ও সুস্থা) সর্বত্রই চীনা আগ্রাসনের প্রমাণ রয়েছে ছড়িয়ে ছিটিয়ে। এমনকী সবসময় আক্রমণ না করলেও ভারতে অনুপ্রবেশ করে ভারতীয়দের অসম্মান করে যায়। গাছের ফলপাকুড় নষ্ট করে যায়। কিন্তু কংগ্রেসি জমানায় এসব আটকানোর কোনো প্রচেষ্টাই করা হয়নি। কংগ্রেস বরবাবর বলে এসেছে, পঞ্চশীল চুক্তি অনুযায়ী ভারত চীনকে আক্রমণ করতে পারে না। অথচ একবারও কংগ্রেসকে বলতে শোনা

সম্প্রতি গালওয়ানে চীন-ভারতের সেনার সংঘর্ষ নিয়ে সিপিএমের মুখপত্র গণশক্তিতে বিকৃত সংবাদ পরিবেশনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ।

যায়নি, পঞ্চশীল চুক্তি মেনে চলার দায় ছিল চীনেরও। তারা সেই চুক্তি ভেঙেই ১৯৬২-তে ভারত আক্রমণ করেছে। চুক্তি ভেঙেই তারা বারবার ভারতে অনুপ্রবেশ করছে।

ভারতের মাটিতে একটা আ-স্বাধীনতা সমস্যা আছে। তা হলো, ভারত-চীন সংঘাত প্রসঙ্গে ভারতের মাটিতে চীনের গুপ্ত এবং ব্যাপ্ত চরের রমরমা। তাই কেন্দ্রে নরেন্দ্র দামোদরদাস মোদী শাসিত এনডিএ সরকার প্রতিষ্ঠার পর থেকেই এই গুপ্ত এবং ব্যাপ্ত চরেরা চীনের অনুপ্রবেশের প্রসঙ্গ উঠলেই রে রে করে ওঠেন। কারণ বিজেপি পরিচালিত সরকার কেন্দ্রে প্রতিষ্ঠা হওয়ার পরই চীনকে আটকে রাখার চেষ্টা শুরু হয়েছে তাঁদের নিজেদের সীমার মধ্যে। বাজপেয়ী সরকার পাক-অনুপ্রবেশ রুখতে গিয়েই কার্গিল সীমান্তে যুদ্ধের মুখোমুখি হয়েছিল। এবারও চীনকে রুখতে গিয়ে যুদ্ধ যুদ্ধ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে লাদাখ সীমান্তে। চীনের প্রতি দরদি মানুষগুলোর এতে কী লাভ? এ প্রশ্নের সহজ উত্তর— এই চীনপ্রেমীরা তাঁদের দেশমাতার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করতে প্রস্তুত, কিন্তু চীনের সঙ্গে নয়। কারণ সেখানে দেওয়া-নেওয়া সম্পর্ক আছে। একেবারে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি সৃষ্টি হওয়ার সময় থেকেই। পরে সিপিআই ভেঙে সিপিআইএমের জন্মের পিছনেও আছে সেই দেওয়া-নেওয়ার ইতিহাস। তাই তো ২০১৫ সালের ২০ অক্টোবর বেজিং-এ ভারতীয় সিপিআই(এম) নেতা, (বর্তমান দলীয় সাধারণ সম্পাদক) সীতারাম ইয়েচুরি চীনে গিয়ে দেখা করেছিলেন চীনের রাষ্ট্রপতি শি জিনপিং এবং উপরাষ্ট্রপতি লিইউয়ানচাও-এর সঙ্গে। হাসিমুখে করমর্দন করেছিলেন। তখন চীনা রাষ্ট্রপতি সীতারাম ইয়েচুরিকে বলেছিলেন— "Communist Party of China (CPC) highly valued its relations with the CPI(M). CPI(M) is a strong votary for driving the relationship between China and India, including people-to-people ties." অর্থাৎ জিনপিং স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন ভারতের সঙ্গে তাদের রাজনৈতিক যোগাযোগের মাধ্যম সিপিআই(এম)। আর সেই বাধ্যবাধকতার কথা মনে রেখেই বোধহয় সীতারাম ইয়েচুরি এবার গত ১৯ জুন মন্তব্য করেছেন, "ভারতের উচিত পঞ্চশীল চুক্তি মেনে চলা।" কিন্তু একবারের জন্যও বলেননি, চীন ও ভারতের মধ্যে স্বাক্ষরিত পঞ্চশীল চুক্তি অবিরামভাবে ভেঙে চলেছে চীনই। ১৯৬২সালে অতর্কিত ভারত আক্রমণ

তার সবচেয়ে বড়ো প্রমাণ। তাঁরা চান না, মোদী চীনকে আটকান। কারণ তাতে তাঁদের ক্ষতি। আর্থিক এবং রাজনৈতিক দুদিক থেকেই।

আর এই চীনপ্রেমীরাই চিৎকার করে গগন ফাটাচ্ছেন মোদীকে টার্গেট করে। মোদী নাকি ভারতীয় সৈন্যদের আত্মহত্যার পথে ঠেলে দিচ্ছেন।

কতদূর সত্যি এই অভিযোগ?

বালখিল্য এই অভিযোগের জবাব দেওয়াটা আর এক দফা বালখিল্যতা। কিন্তু না দিয়ে উপায় নেই। চীনপ্রেমীরা চাইতেন পারেন— ভারত হয়ে উঠুক চীনা উপনিবেশ। কিন্তু আপামর ভারতবাসী দেশপ্রেমে বিশ্বাসী। জাতীয়তাবাদ বিশ্বাসী। এক দেশ এক নিশান এক নেতায় বিশ্বাসী। চীনাপ্রেমীরা যত বেশি মোদীজীকে দেশের শত্রু বানাতে চাইবে— মানুষ তত বেশি করেই তাঁর চীন বিরোধী পদক্ষেপকে স্বাগত জানাবে। কারণ চীনাপ্রেমীদের মতো কোনও ভারতীয়ই এমনকী সেনাবাহিনীর যেসব অকুতোভয় যুবক সেনারা চীন সীমান্তে লড়াই করে দেশরক্ষা করেছেন তাঁরাও চাইবেন না, ভারতের মাটিতে পা রাখুক চীন। পা রাখলে সংঘাত হবে। সংঘাতে কখনও কখনও দু' পক্ষেরই প্রাণ যাবে। যুদ্ধের, সংঘাতের নিয়মই তাই। চীনপ্রেমীরা যদি মনে করেন, চীনাদের আদর করে ডেকে আনবেন ভারতবাসী তাহলে ভুল করবেন। বরং তাঁদেরই ভাবতে হবে, চীন তাঁদের আশ্রয় দেবে কিনা। কারণ গুপ্তচর এবং ব্যাপ্তচরদের বেশিদিন ভারতের মাটিতে রাখা যাবে না। স্বাধীনতার আগে থেকেই ভারতবাসীর একাংশই ভারতের সর্বনাশ করে এসেছে। আজও সেই চেষ্টা অব্যাহত।

এই মুহূর্তে বহু ভারতবাসী আবেগের বশে চীনাদ্রব্য বয়কটের ডাক দিচ্ছেন। উদ্যোগকে স্বাগত। কিন্তু মনে রাখতে হবে— গোটা পৃথিবীই ঢেকে গেছে চীনা উৎপাদনে। দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় এমন অনেক জিনিসের জন্যই অন্যান্য দেশের মতোই ভারতের মানুষও চীনের ওপর নির্ভরশীল। বিশ্বায়নের যুগে কোনো দেশই কোনো দেশকে বয়কট করে চলতে পারে না। যতদিন না ভারতবর্ষ স্বনির্ভর হয়ে উঠছে সর্বাংশে, ততদিন বয়কটের প্রশ্নটা তুলে রাখাই ভালো। তবে যেসব জিনিস বয়কট করা সম্ভব যেমন খেলনা, জামা-কাপড়, জুতো, ছোটোখাটো দৈনন্দিন ব্যবহার্য জিনিস--- সেগুলো বয়কট করাটাই কাম্য । কারণ সেগুলোর বিকল্পের অভাব নেই। কিন্তু ভেবে দেখুন— একটা ভালো মোবাইল ফোন ব্যবহার করতে হলে আপনি কী চীনকে বয়কট করে চলতে পারবেন? কারণ 'অ্যান্ড্রয়েড' টেকনোলজিটাই চীনের। আর তাছাড়া ভারতে চীনের অনুপ্রবেশ একটা রাজনৈতিক ও প্রতিরক্ষা সম্পর্কিত বিষয়। সেটার ওপরেই জোর দিয়ে চীনকে উদ্দেশ্য করে আমাদের সংগঠিত হওয়া দরকার। চীনকে মনে করিয়ে দেওয়া দরকার— এটা ১৯৬২ সাল নয়।

চীনকে মনে করিয়ে দেওয়া দরকার, জওহরলাল নেহরু এখন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নন। চীনকে মনে করিয়ে দেওয়া দরকার— শুধু ভারতে নয়, গোটা পৃথিবীতেই তোমাদের প্রেমিকরা প্রায় নিশ্চিহ্ন। এ ভারত অন্য ভারত। এ ভারত নয়া ভারত। এ ভারতে পা রাখলে আমাদের চেয়ে অনেক বেশি রক্ত ঝরবে তোমাদের। ■

মানবজাতির স্বার্থে চীনের সঙ্গে লড়াইটা জেতা অত্যন্ত প্রয়োজন

সঞ্জয় সোম

ভারতীয় সেনাকে আক্রমণ করে চীন একটা মস্ত বড়ো ভুল করে ফেলেছে। অস্তিত্বসংকট হলে মানুষের মাথার ঠিক থাকে না, অনেক সময় আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলে। চীনের কমিউনিস্ট পার্টি আজ একদম খাদের কিনারে এসে পৌঁছে গেছে, যে কোনো সময় তার পতন ঘটতে পারে। এমনিতেই চীনা ভাইরাসের দৌলতে পৃথিবী জুড়ে যে অতিমারীর প্রকোপ চলথে তাতে প্রতিটি দেশ চীনের ওপর তথ্য গোপন করার কারণে অত্যন্ত বিরক্ত। চীনের বন্ধু বলতে গুটিকতক মাত্র দেশ রয়ে গেছে, যারা আর্থিক কারণে তার ওপর নির্ভরশীল। বিশ্ব জুড়ে আর্থিক মন্দার জেরে চীনের হাজার হাজার কোটি ডলারের বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভ মুখ থুবড়ে পড়েছে। ঋণ শোধ না করতে পারার ফলে যে সব দেশের জাতীয় সম্পত্তির ওপর চীন থাবা বাড়িয়েছিল, সেসব দেশের মানুষও খেপে গিয়ে তাঁদের নিজেদের সরকারের ওপর চুক্তি বাতিল করকার জন্য চাপ বাড়াচ্ছে। তার ওপর চীনের অভ্যন্তরীণ আর্থ-সামাজিক অবস্থাও বিশেষ ভালো নয়। কয়েকবছর ধরে অর্থনৈতিক বৃদ্ধির হার যেমন যেমন কমেছে সেই অনুপাতে বেরোজগারি এবং গরিবিও বেড়েছে। চীনের গ্রামে গ্রামে আজ অসন্তোষের আগুন ধিকিধিকি জ্বলছে। বিদ্রোহী হংকং অশান্ত, তাইওয়ান ঘাড়ের ওপর বসে রোজ বিদ্রূপ করছে আর উইঘুরে হাজার চেষ্টা করেও ধর্মীয় ভাবাবেগ রোখা যাচ্ছে না। উপরন্তু চীনের বর্তমান রাষ্ট্রপতি শি জিনপিং নিজেকে আজীবন রাষ্ট্রপতি ঘোষণা করে বসে থাকার পর প্রধানমন্ত্রী লি কিউয়াং এবং কমিউনিস্ট পার্টির অন্যান্য প্রভাবশালী নেতারা মন থেকে তা মেনে নিতে পারছেন না।

এমতাবস্থায়, চীনা শাসকগোষ্ঠী নিজের দেশের মানুষের দৃষ্টি ঘোরানোর জন্য জাতীয়তাবাদের আঁচলে মুখ লুকাতে চাইছে। সাউথ চায়না সিতে নৌসেনা পাঠিয়ে প্রতিবেশী দেশগুলোকে ভয় দেখাতে চেয়ে এখন পালিয়ে আসতে বাধ্য হয়েছে। কারণ তাদের সমর্থনে আমেরিকা তিন তিনখানা যুদ্ধবিমানবাহী রণপোত পাঠিয়ে ওখানে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। ভারত যেহেতু চিরকাল সৌহার্দ্য ও আলাপ আলোচনায় বিশ্বাসী, তাই চীন ভেবেছিল ভারত বুঝি নরম মাটি। ওরা আস্ফালন করবে আর ভারত প্রতিদানে শান্তিপ্রস্তাব দেবে, দেশের লোকের সামনে শি জিনপিং হিরো হবেন। তিনি ভুলে গিয়েছিলেন যে, ১৯৬২-র যুদ্ধে নেহরু ভারতীয় সেনার হাত-পা বেঁধে রেখেছিলেন, অস্ত্র ছিল না, বিমানবাহিনীকে উড়তেই দেননি, তাই চীন আকসাই চীন দখল করতে সক্ষম হয়েছিল। নেহরু নিজের সেনাবাহিনীকে ভয় করতেন আর নিজেকে বিশ্বস্তরের নেতা মনে করতেন, দুটোই ছিল মস্ত বড়ো ভুল। আজকের ভারত কিন্তু নেহরুর ভারত নয়, মোদীর ভারত। এই সরকার সেনাকে সম্মান করে এবং দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষার ক্ষেত্রে তার ওপর নির্ভরও করে। সেনাকে নিজের প্রক্রিয়াগত সিদ্ধান্ত নিজেই নেওয়ার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে আর সরকার সর্বক্ষেত্রে সম্পূর্ণভাবে বাহিনীকে মদত করছে। বাহিনীর প্রয়োজন অনুযায়ী প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে ভারতের পারমাণবিক অস্ত্র প্রয়োগবিধিও যে বদলে গেছে, এটা যেন চীন বিস্মৃত না হয়।

চীন গালওয়ান উপত্যকায় দুই দেশের বর্তমান সীমান্তরেখার ওপর ভারতীয় সেনার কুড়িজন সৈন্যকে হত্যা করে মারাত্মক ভুল করেছে। আমাদের প্রধানমন্ত্রী যখন বলেছেন এই বলিদান বিফলে যাবে না তখন চীনের ভয়

পাওয়ার যথেষ্ট কারণ আছে। ভারতের প্রধানমন্ত্রী কিন্তু তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া দেননি এবং সবদিক না ভেবে তিনি কখনোই কিছু বলেন না। ১২৫ কোটি ডলারের চীনা বিনিয়োগ সম্পন্ন প্রস্তাবিত চীন-পাকিস্তান অর্থনৈতিক করিডোরটি নেহরুর আমলে চীনের দখল করা ভারতীয় আকসাই চীন এলাকা এবং পাকিস্তানের দখল করা ভারতীয় গিলগিট-বালতিস্তান ও কাশ্মীর উপত্যকার কিছু অংশের ওপর দিয়ে যাচ্ছে। সংসদে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ আগেই ঘোষণা করে দিয়েছিলেন যে এই দখল হয়ে যাওয়া এলাকা ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ। কিছুদিন আগেই ভারত এই গোটা অঞ্চলের নতুন মানচিত্র প্রকাশ করেছে। ব্যাপারটা হয়তো আরও কিছুদিন বৌদ্ধিক আলোচনার স্তরে সীমাবদ্ধ থাকতো। খুঁচিয়ে ঘা করতে গিয়ে চীন সেটাকে একেবারে সামরিক সংঘর্ষের জায়গায় এনে ফেললো। এতে আখেরে ভারতে লাভ এবং চীনের প্রভূত ক্ষতি অবশ্যম্ভাবী।

অনেকেই বলেন চীনের যা সামরিক শক্তি, তার সঙ্গে এঁটে ওঠা দুষ্কর, কারণ ভারত অনেক পিছিয়ে আছে। হ্যাঁ, সংখ্যার দিক দিয়ে হয়তো আমরা খানিকটা পিছিয়েই আছি। কিন্তু যুদ্ধে সংখ্যাই যে সব নয়, বাহিনীর গুণগত মান এবং যুদ্ধকৌশল সম্বন্ধীয় ব্যুৎপত্তি যে অনেক বেশি কার্যকর, সেটা যাঁরা যুদ্ধ বোঝেন তাঁরা সবাই একবাক্যে স্বীকার করেন। চীনের ভূভাগ ভারতের প্রায় তিনগুণ। স্বভাবতই তাদের সৈন্যসংখ্যা এবং সাজসরঞ্জামও ভারতের চেয়ে বেশি। কিন্তু চীনের পক্ষে সমস্ত সীমান্ত অরক্ষিত রেখে একদিকে মনোনিবেশ করা সম্ভব নয়, কারণ সত্যিই যদি ভারতের সঙ্গে চীনের যুদ্ধ লাগে, এত শত্রু ওরা চারপাশে সৃষ্টি করেছে যে সেক্ষেত্রে একসঙ্গে নানা ফ্রন্ট খুলে যাওয়ার সম্ভাবনা অত্যন্ত প্রবল, যা চীন সামলাতে পারবে না। ভুলে গেলে চলবে না যে, চীন জীবনে কোনো যুদ্ধ জেতেনি। বাষট্টির যুদ্ধেও জেতেনি, কারণ নেহরুর ভুল পলিসির জন্য ভারত হেরে গিয়েছিল, তাতে চীনের বিন্দুমাত্র শ্রেয় ছিল না। ১৯৭৯-এ ভিয়েতনামের মতো একটা ছোটো গরিব দেশ পর্যন্ত চীনা সৈন্যবাহিনীকে নাস্তানাবুদ করে ছেড়েছিল, এতটাই যে তারপর থেকে চীন আর কোনো যুদ্ধই করেনি।

চীনা সৈন্যরা সব এক সন্তান পলিসির ফসল, আলালের ঘরের দুলাল। মাত্র ৪৫ দিনের প্রশিক্ষণের পর দু'বছরের বাধ্যতামূলক পরিষেবা দিতে সৈন্য সাজে, তুলনামূলকভাবে নিয়মিত সেনার সংখ্যা অনেক কম। এরা পাহাড়ের যুদ্ধ, মরুভূমির যুদ্ধ, ছায়াযুদ্ধ, মানসিক যুদ্ধ কোনো কিছুতেই তেমন পারদর্শী নয়। সবচেয়ে বড়ো কথা, চীনা সৈন্যবাহিনী কোনো কঠিন পরীক্ষায় কোনোদিন উত্তীর্ণ হয়নি। ১৯৬৭-তে ভারতে প্রবেশ করার চেষ্টা করে এমন মার খেয়েছিল যে আর দ্বিতীয়বার ওমুখো হয়নি। অন্যদিকে ভারতীয় সেনা পুরোটাই পেশাদার, জন্মলগ্ন থেকে যুদ্ধ করতে করতে সদাপ্রস্তুত, নির্ভয়, কৌশলী, সক্ষম এবং প্রত্যয়ী। ভারতীয় সেনা হারতে জানে না, তারা শত্রুর ঘরে ঢুকে নির্বিঘ্নে তাদের মেরে দিয়ে আসে। যে কঠিন প্রশিক্ষণের মধ্যে দিয়ে ভারতীয় সেনাকে যেতে হয় এবং সেনাবাহিনীতে ক্রমাগত যে ধরনের অনুশীলন চলতে থাকে তাতে যে কোনো পরিস্থিতির মোকাবিলা করার জন্য তাঁরা সর্বদা প্রস্তুত থাকেন। ভারত একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র, এখানে প্রত্যেক নাগরিকের প্রাণের দাম আছে। ভারতীয় সেনার নিজস্ব মর্যাদা আছে, পরম্পরা আছে, ঐতিহ্য আছে। ভারত চীন নয়। আর ভারতীয় সেনাও কেবল কুচকাওয়াজপটু চীনা পিপলস লিবারেশন আর্মি নয়। ভারতীয় সেনা যে কাজে হাত দেন, সেটা শেষ না করে ছাড়েন না।

তবে একটাই জায়গায় আমরা কমজোর।

চীনে একজনও ভারতপন্থী নেই অথচ ভারতে বহু চীনপন্থী আছে। শুধু চীন নয়, পাকিস্তানপন্থীও আছে বিস্তর। আর এরা পাড়ার চায়ের দোকান থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের চত্বর হয়ে সংবাদমাধ্যমের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ঘুণপোকার মতো ছেয়ে আছে। চীনের মতদপুষ্ট রাজনৈতিক দল ও দলনেতারও অভাব নেই আমাদের দেশে। আমাদের দেশের বাকস্বাধীনতা, সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা আর গণতান্ত্রিক পরিকাঠামোকে ব্যবহার করে চীন বহুদিন ধরে এখানে সরকারবিরোধী জায়তাবাদবিমুখী একটা বাতাবরণ সৃষ্টি করতে চাইছে, যা সফল না হলেও দেশের অগ্রগতিকে খানিকটা ব্যাহত নিশ্চয় করেছে। আমাদের চরিত্রগত চরম সহিষ্ণুতা পক্ষান্তরে দেশের ভেতরে বসে থাকা এই ভারতবিদ্বেষী শক্তিকে খানিকটা পুষ্টই করেছে। সেনাবাহিনী সীমান্তে তাঁদের কাজ করবেন ঠিকই কিন্তু চীনের বিরুদ্ধে লড়াই তো শুধু সীমান্তে নয়, দেশের ভেতরেও।

যেদিন কিছু রাজনৈতিক দল অস্তিত্বহীন হবে, কিছু সম্পাদক গ্রেপ্তার হবেন, কিছু অধ্যাপকের চাকরি যাবে, কিছু চীনা দালালকে প্রকাশ্যে কোমরে দড়ি বেঁধে টানতে টানতে পুলিশ জেলে নিয়ে যাবে, সেদিন কিন্তু আমাদের সত্যিকারের শুদ্ধিকরণ শুরু হবে। চীনের বিরুদ্ধে লড়াইটা মূলত একটি স্বৈরাচারী আত্মকেন্দ্রিক অমানবিক মানসিকতার বিরুদ্ধে লড়াই। গোটা মানবজাতির স্বার্থে এই লড়াইটা জেতা অত্যন্ত প্রয়োজন। ■

ভারতের উপর চীনের চাপিয়ে দেওয়া যুদ্ধ

ডাঃ আর এন দাস

আমার দৃঢ় বিশ্বাস, দূরদৃষ্টিহীন হিন্দুবিরোধী নেহরুর চীনের সঙ্গে বন্ধুত্ব করাটাই হয়েছিল মস্তবড়ো ভুল! দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার জাপান ও ইজরায়েলকে এড়িয়ে আরবের সঙ্গে বন্ধুত্ব করার মধ্যে তাঁর ইসলাম প্রীতির প্রতিফলন দেখা যায়। স্বাধীন ভারতে সংবিধানের সৃষ্টিকর্তারাও চেয়েছিলেন, নেহরুর পরিবর্তে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের মতো দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ও দেশভক্ত এক প্রজারঞ্জক প্রধানমন্ত্রীকে। ভারতের সংস্কৃতি ও ইতিহাস সম্পর্কে অজ্ঞ নেহরু ইউরোপ-আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রীয় মডেলকেই ভারতে আমদানি করতে চেয়েছিলেন। আজ যদি হিন্দু ভারতের এক হিন্দু সংবিধান হতো, তবে কমিউনিস্ট নেপালের আজ এই দুর্দশা হতো না। নেপালেশ্বর ত্রিভুবন শা'হ ১৯৫১ সালে নেহরুকে নেপালের ভারতবিলয়ের আহ্বান জানিয়েছিলেন। তাহলে চীন, জাপান, কোরিয়া, কম্বোডিয়া ইত্যাদি দেশ স্বেচ্ছায় ভারতে বৌদ্ধস্তূপ বানিয়ে হিন্দু-বৌদ্ধ মিলনের তীর্থস্থান নির্মাণ করতো যেমন ইসলামের মক্কা-মদিনা বা খ্রিস্টানদের জন্য রোমের ভ্যাটিকান। বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের সঙ্গে সীমান্ত বিবাদও সমাপ্ত হয়ে যেত। আর ভারতের বেদভিত্তিক সমাজবাদে বিশ্ব-ধ্বংসকারী 'টোটালিটেরিয়ান' মতবাদের সৃষ্টি ও পুষ্টিও হতো না।

দূরদৃষ্টিহীন নেহরু হিন্দি-চিনি ভাই ভাই করে ১৯৬২ সালের চীনযুদ্ধে পরাজয়ের অসহ্য গ্লানিতে ১৯৬৪ সালে পরলোকগমন করেন। ইন্দিরা গান্ধী তাঁর রাজত্বকালে শিখ আর তামিল হিন্দুদের সম্মান কিংবা শিক্ষাদানের পরিবর্তে অকালমৃত্যু আর নরসংহার এনে দিয়েছিলেন। ১৯৭১ সালের যুদ্ধে ইসলামিক বাংলাদেশের সৃষ্টিতে ভারতের পূর্বদিকের সুরক্ষা বিঘ্নিত হয়েছিল। সিমলা সমঝোতায় '৭২ সালে ৯৩ হাজার পাকিস্তানি সৈনের নিঃশর্ত মুক্তি, অনিষ্পন্ন কাশ্মীর সমস্যা আর অক্ষুণ্ণ ৩৭০ ধারা, তাঁর নির্বুদ্ধিতারই পরিচয় দেয়। হাইকোর্টকে অমান্য করে জরুরি অবস্থা জারি, ১৯৭৫ সালে বিরোধী দলনেতাদের জেলবন্দি করে গণতন্ত্রের সমাধি দিয়েছিলেন তিনিই।

সাম্প্রতিক চীন-ভারত সীমান্তের খণ্ডযুদ্ধের সর্বশেষ সংবাদে জানা যাচ্ছে, কম্যান্ডিং অফিসার কর্নেল সন্তোষবাবু-সহ ভারতের ২০ জন জওয়ান শহিদ হয়েছেন। চীনের ১ অফিসার সহ ৪৫ জন সেনাকে নিকেশ করেছে ভারতীয় জওয়ানরা। আগ্রাসী চীনের সীমান্তবিবাদ, ভারত, জাপান ও রাশিয়া ছাড়া আরও ১৪টি দেশের সঙ্গে আছে। কংগ্রেস রাজত্বে চীন '৫০ সালে তিব্বত গ্রাসের পর, '৬২ সালে আকশাই চীন, '৬৩ সালে কারাকোরাম, ২০০৮ সালে চাওজি ঘাঁটি, ২০১৩-তে রোকনুলা এবং ২০১৭ সালে ভুটানের ডোকলামকে প্রায় গ্রাস করে ফেলেছিল, কিন্তু ১৮ জুন ভারতীয় সেনার 'অপারেশন জুনিপার'-এর কারণে চীনকে পশ্চাদপসরণ করতে হয়। উত্তরকোরিয়া, পাকিস্তান ও আফ্রিকার দেশগুলি চীনের ঋণ-জালে আবদ্ধ। সাম্রাজ্যবাদী চীনের অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতিও ভয়ানক। ডুবন্ত

অর্থনীতি ও স্বৈরাচারী শাসকের তথাকথিত সাম্যবাদে অতিষ্ঠ দেশের জনগণ। চিরশত্রু আমেরিকার সঙ্গে অর্থনৈতিক ছায়াযুদ্ধ। জাপান, অস্ট্রেলিয়া, ইউরোপীয় ক্যাপিটালিজমের সঙ্গে চৈনিক কমিউনিজমের চিরস্থায়ী দ্বৈতসমর চলছে।

চীন বা ভারত কেউই পূর্ণযুদ্ধে জড়িয়ে পড়তে চায় না। দুই দেশই শক্তি প্রদর্শনের জন্য সীমান্তে ট্যাঙ্ক বা সৈন্যসংখ্যা বাড়াচ্ছে মাত্র। কারণ একটা যুদ্ধ লাগলে আগামী ৩০ বছরের অর্থনৈতিক ক্ষতি এবং আর্থিক বিকাশের প্রতিবন্ধকতাকে স্বীকার করে নিতে হয়। আর্থিক বিকাশের মানদণ্ডে ভারত এখন এশিয়ায় প্রথম এবং সারা বিশ্বে তৃতীয় স্থানে। আইএমএফের বিবৃতিতে, করোনা মহামারী চীনের বেকারিত্বের হার ৩.৮ শতাংশ বাড়িয়েছে। অভূতপূর্ব আর্থিক মন্দায় চীন এখন বিধ্বস্ত। ২০২০ সালের প্রারম্ভেই চীনের জিডিপি ৬.৮ শতাংশে নেমেছে। চীনাদের মধ্যে বিক্ষোভ এখন চরমে উঠে গেছে। প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং সারা বিশ্বে উহান প্রদেশে চীনা গবেষণাগারের তৈরি কৃত্রিম ভাইরাস করোনার দ্বারা জৈব-আতঙ্ক ছড়ানোর অভিযোগে একঘরে হয়ে পড়েছেন। মে মাসের শুরুতেই নিয়ন্ত্রণ রেখার ওপর আকশাই চীন থেকে নির্গত গালওয়ান নদী, একটি উষ্ণপ্রস্রবণ এবং তিব্বত-ভারতের মধ্যস্থিত ৪৩৫০ মিটার উঁচুতে ১৩৪ কিলোমিটার দীর্ঘ প্যাঙ্গং তাসো ঝিল— এই তিনটি স্থানকেই সম্প্রসারণবাদী চীন দখল করতে চাইছিল। ১০ মে থেকেই চীন সেনা সমাবেশ করেছ। বাধ্য হয়ে ভারতকেও সেখানে সৈন্যসমাবেশ করতে হয়েছে।

২০২০-তে নরেন্দ্র মোদী কিন্তু ১৯৬২ সালে নেহরুর দুর্বলতাকে মেনে নিতে পারেননি। মধ্যস্থতার কারণে জুন মাসের প্রারম্ভেই শেষোক্ত দুই স্থানের দখল-লড়াইয়ের উত্তেজনা কমে গিয়েছিল। কিন্তু ১৫ জুন রাত্রে পূর্ব লাদাখের গালওয়ান ঘাঁটিতে দুই দেশের সেনার মধ্যে গোলাগুলির পরিবর্তে ভয়ানক লাঠি ও মুঠির লড়াই হয়েছিল।

ভারতের পূর্ব লাদাখ, লেহ ও কারগিলের কাছে গালওয়ান ঘাঁটি হচ্ছে গালওয়ান নামের এক সংযোজক নদীর তটভূমি। আকাসাই চীনের পশ্চিমে সিন্ধুনদীর শাখা শ্যোক নদী যা গালওয়ানকে সংযুক্ত করেছে এই অঞ্চলে। লাদাখেরই বাসিন্দা খোঁজকর্তা গোলাম রসুল গাওয়ানের নামে ওই নদীটির নামকরণ করা হয়েছে। বিস্তারবাদী চীন সেটাকেই দখল করতে চেয়েছিল। চীনের প্ররোচনায় নেপালের প্রধানমন্ত্রী ও কমিউনিস্ট শাসক কে পি শর্মা অলিও ২০ মে, ভারতের উত্তরাখণ্ড-তিব্বত সংলগ্ন লিপুলেক সীমান্তে অহেতুক বিবাদে লিপ্ত হয়ে পড়েন। এখানেই ১৯৬২ সালের যুদ্ধে চীন লাদাখে আটত্রিশ হাজার বর্গকিলোমিটার দখল করে নিয়েছিল। ধর্মেন্দ্র-বলরাজ সাহনীর ১৯৬৪ সালের

চীনের দালাল বামপন্থী তথাকথিত অর্থনীতিবিদরা অবশ্য ঠিক সময়েই অভিনয়ে নামবেন। বেতনভোগী এই দেশদ্রোহীরা মাঝারি ও ছোটো ক্রেতা-বিক্রেতাদের ভুল তথ্যের সাহায্যে বিভ্রান্ত করে ভারতের অপূরণীয় ক্ষতি ও চীনের অস্বাভাবিক মুনাফা করাবেন।

হিটফিল্ম ‘হকিকত’-এর স্যুটিং এখানেই হয়েছিল। ময়ূরকণ্ঠী লতার স্বরে, ‘জো শহিদ হুয়ে হ্যায় উনকী জরা ইয়াদ করো কুরবানী’ আজও সমস্ত দেশবাসীর হৃদয় ছুঁয়ে যায় অদ্ভুত এক বীররসের প্লাবনে। ১৯৬২ সাল থেকেই চীনের আগ্রাসনকে প্রতিরোধ করার জন্য আপত্তি সত্ত্বেও এই দুর্গম অঞ্চলে সেনার সঙ্গে ‘বর্ডার রোড অর্গানাইজেশন দারবুক শেইখ-দৌলত বেগ ওল্ডি বা ডিএসডিবিও সড়ক নির্মাণ শুরু করেও কিন্তু শেষ করতে পারেনি। ২৫০ কিলোমিটার দীর্ঘ শ্যোখ নদীর সমান্তরালে চলা এই সড়কটি সামরিক ও বেসামরিক দৃষ্টিতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রধানমন্ত্রী মোদীর ব্যক্তিগত প্রচেষ্টাই ২০১৯ সালেই অবিশ্বাস্য গতিতে একটি সেতু-সহ এই সড়কটির নির্মাণকার্য সম্পূর্ণ হয়ে যায়। সেজন্যই ভারতের ওপর চীনের এত রাগ।

দুর্গম পার্বত্য উপত্যকায় জনগণের যাতায়াত, খাদ্যসামগ্রী ও রসদভর্তি ট্রাক চলাচলের বিশেষ উপযোগী করেই সেতু-সহ সড়কটি নির্মিত হয়েছিল। প্রয়োজনে টহলদারি পল্টন, ট্যাঙ্ক ও ভারী অস্ত্রশস্ত্রের সরবরাহ যাতে ১৯৬২ সালের মতো বিঘ্নিত হয়ে না পড়ে তার জন্য সোবাহিনী পূর্বপ্রস্তুতি নিচ্ছিল। যশস্বী কেন্দ্রীয় পরিবহণমন্ত্রী নীতীন গড়করি যেমন সারাদেশে অসংখ্য সেতু-সহ সড়ক তৈরি করে কীর্তিমান হয়েছেন, তেমনি বিআরও দেশ ও দেশবাসীর সুরক্ষাকে নিশ্চিত করেছে।

১৯৬২ সালের চীনযুদ্ধের পরাজয়ে এবং চীনের আগ্রাসনের কথা বিবেচনা করে, সেনাবাহিনীর দাবি ছিল লেহ্ ও শেইখ ঘাঁটির মধ্যবর্তী অঞ্চলে শীঘ্রই স্থায়ী সেনাছাউনি স্থাপন করা হোক, কিন্তু তৎকালীন দুর্বল কেন্দ্রীয় সরকারের দোদুল্যমান মনোভাবের জন্য তা বাস্তবায়িত হয়ে ওঠেনি। মৌনী মনমোহন সিংহ ভ্যাটিক্যান দ্বারা পরিচালিত সোনিয়ার সিলমোহরের অপেক্ষায় বসে থেকে শেষ পর্যন্ত সেই কাজটি করার সাহস পর্যন্তও দেখাতে পারেননি।

সিকিমের নাথুলা পাসে ১৯৬৭ সালে ৩০০ চীনা সৈন্যকে মেরে ৮৮ জন ভারতীয় সেনা শহিদ হয়েছেন। অরুণাচল প্রদেশেও ১৯৭৫ সালে অসম রাইফেলের ২০ জন

জওয়ান পিএলএ-র অতর্কিত অ্যামবুশ অ্যাটাকে শহিদ হয়েছেন। এবারে ১৫-১৬ জুন চীনের সৈন্য পূর্ব লাদাখের ভূভাগ জোর করে দখল করতে চেয়ে অনাবশ্যক বিবাদে জড়িয়ে পড়ল। আসলে এশিয়ার মুকুটহীন সম্রাট চীন ভারতকে পাকিস্তান ও উত্তর কোরিয়ার মতোই তার অধীনস্থ করে রাখতে চায়। তার প্রভুত্ব যেন অদ্বিতীয় থাকে। চীনের এই আগ্রাসনকে শক্তিবলে প্রতিরোধ করার ক্ষমতা আমেরিকা ছাড়া এই মুহূর্তে সারাবিশ্বে আর কারুর নেই!

দেশের এই দুরবস্থায় দেশদ্রোহী চীনা দালালদের কথা আমাদের স্মরণ রাখা জরুরি হবে! স্বার্থান্বেষী কীটরা ক্ষুদ্র স্বার্থের কারণে দেশমাতৃকাকে বিক্রি করতেও পিছপা হবে না! কেউ 'ছাপান্ন ইঞ্চি ছাতির' মোদীকে কটাক্ষ করছে তো কেউ বীর শহিদদের বিদ্রূপ করছে! সেসব দেশদ্রোহীদের বিরোধিতা করলেও দেশের মঙ্গলই হবে। তারা মোদীকে উস্কাচ্ছে, ২০১৭ সালের উরিতে ১৯ জন শহিদ ও সার্জিক্যাল স্ট্রাইকের উদাহরণ দিয়ে। স্পষ্ট মনে আছে, ২০১৭ সালে ভারতীয়সেনা যখন ডোকলাম থেকে চীনা সেনাদের 'পিছু হটতে' বাধ্য করছিল, সে সময়েই কংগ্রেসের রাহুল গান্ধী রাতের অন্ধকারে দিল্লিস্থিত চীনা দূতাবাসে গভীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন। কংগ্রেস- কমিউনিস্টরা ওঁত পেতে প্রতীক্ষা করছে, কীভাবে একজন সত্যিকারের দেশভক্তকে কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে ফেলে দিল্লির ক্ষমতা দখল করা যায়!

হ্যাঁ, আমাদের মতো সাধারণ নাগরিকরাও দেশ ও দশের স্বার্থে অনেক কিছুই করতে পারি! চীনাসামগ্রীর অবিলম্বে বর্জন করাই হচ্ছে চীনের বিরুদ্ধে আর্থিক যুদ্ধকৌশলের প্রথম সূত্র। ঠিক একশো বছর আগে স্বদেশি আন্দোলনে ২৯২০-তে বিপ্লবীরা চারণকবি মুকুন্দ দাসের সঙ্গে গলা মিলিয়ে গেয়েছিল, 'ভেঙে ফেল রেশমি চুরি'। চীন প্রতিবছর ভারতে ৫০ মিলিয়ন ডলারের চীনাসামগ্রী রপ্তানি করে। আর নগণ্য পরিমাণে আমদানি করে। চীনের রপ্তানি ২০২০-তে ২.১ শতাংশ বেড়ে হয়েছিথল ৫১৫ বিলিয়ন ইউয়ান। একই সময়ে ভারত থেকে চীনে রপ্তানি ০.২৫ শতাংশ কমেছে। চীনের সঙ্গে ভারতের এই মুহূর্তে বাণিজ্য ঘাটতি ৩.৩ বিলিয়ান ডলারেরও বেশি। তা সত্ত্বেও মোদী বিরোধী কংগ্রেস-কমিউনিস্টরা ও আরবান নকশাল বুদ্ধিজীবীরা সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করছে এই বলে, 'চীন মাত্র ২ শতাংশ রপ্তানি করে ভারতের সঙ্গে। সুতরাং আর্থিক বহিষ্কারে চীনের বিশেষ কোনো ক্ষতিই হবে না'। চীনের বাণিজ্য উদ্বৃত্ত ২০১৯ সালে ছিল ৪২২ বিলিয়ন ডলার যা ভারতের থেকে অনেক গুণ বেশি। ২০১৯ সালে চীনের সঙ্গে ভারতের বাণিজ্য ঘাটতি হয়েছিল ৫৭ বিলিয়ন ডলারের। চালাক চীন সস্তা এবং নিকৃষ্ট চীনাসামগ্রী তৃতীয় দেশ হংকংয়ের মাধ্যমে ভারতে পাঠাচ্ছে। মুনাফা লুঠছে চীন। বদনাম হচ্ছে হংকংয়ের। বোঝা যাচ্ছে না বস্তুটির আসল উৎসস্থলটি কোথায়। সেজন্যই চীন ভারতকে 'রিজিওনাল কম্প্রিহেন্সিভ ইকোনমিক পার্টনারসিপের' মধ্যে আনতে এত বেশি আগ্রহ দেখাচ্ছে। বামপন্থীরা বলছে, চীন ভারতের তুলনায় বিশালাকার। তাই চীনের সঙ্গে টক্কর মূর্খতারই পরিচয় হবে। জিডিপির হিসেবে চীনের ১৪ ট্রিলিয়নের পাশে ভারতের ২.৭ ট্রিলিয়ন সত্যিই ৫ গুণ বেশি লাগছে কিন্তু পিপিপি মানে 'পারচেসিং পাওয়ার প্যারিটির' নিরিখে ভারতের ৯ ট্রিলিয়নের সঙ্গে চীনের ২২ ট্রিলিয়ন মাত্র ২.৫ গুণ বেশি। আর্থাৎ স্বদেশি দ্রব্যের মূল্য অনেক কম বলেই ভারতীয়দের ক্রয় ক্ষমতাও চীনাদের তুলনায় অনেক বেশি। এই পরিসংখ্যানটিকে মোটেই অগ্রাহ্য করা যায় না।

তাছাড়া বামপন্থীরা বলবে চীনের আর্থিক বহিষ্কারে অসংখ্য দেশীয় ক্রেতা-বিক্রেতার লোকসান হবে এবং দেশে বেকারত্ব বাড়বে। মোবাইল ফোন বা ওষুধ ছাড়াও দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনীয় অসংখ্য চীনাসামগ্রীর কেনা-বেচা করা ছোটো ও মধ্যম বর্গীয় ব্যবসায়ীদের অপূরণীয় ক্ষতি হবে। চীনের দালাল বামপন্থী তথাকথিত অর্থনীতিবিদরা অবশ্য ঠিক সময়েই অভিনয়ে নামবেন। বেতনভোগী এই দেশদ্রোহীরা মাঝারি ও ছোটো ক্রেতা-বিক্রেতাদের ভুল তথ্যের সাহায্যে বিভ্রান্ত করে ভারতেরক অপূরণীয় ক্ষতি ও চীনের অস্বাভাবিক মুনাফা করাবেন।

তাই প্রধানমন্ত্রী মোদী দেশবাসীকে আহ্বান জানিয়েছেন, আত্মনির্ভর স্বাভিমানী ভারত তৈরির জন্য। ভারতে এখন জাপান, কোরিয়া, ফিনল্যান্ড, ইংল্যান্ড, আমেরিকা বা হল্যান্ডে নির্মিত প্রতিদিনকার প্রয়োজনীয় টেকসই জিনিসগুলি সুলভ মূল্যে পাওয়া যাচ্ছে। সেগুলি কিনুন। চীনের ঋণদান ও আর্থিক মৃত্যুফাঁদের কথা অনেকেই শুনেছেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, সস্তার চীনা মাদক দ্রব্যের ব্যবহারে মানুষ এমনই নেশাগ্রস্ত হয়ে যায় যে, তখন চীনের উপরই তার জীবনমরণ নির্ভর করে। এই নির্ভরতার মানে পরমুখাপেক্ষিতা যা হচ্ছে নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ করে বশ্যতা বা অধীনতা স্বীকার করা। সারাবিশ্বে চীন উহানের প্রাণঘাতী কৃত্রিম করোনা মহামারী ছড়ালো। তারপর চীন মাস্ক, ভ্যাকসিন ও ভেন্টিলেটর চড়া দামে ওই আক্রান্ত দেশগুলিতে রপ্তানি করে মুনাফা লুটতে থাকলো। আচ্ছা, আমাদের এ কী ধরনের দেশপ্রেম? সস্তায় নিকৃষ্ট মানের চীনাসামগ্রী কিনে চীনের অর্থব্যবস্থাকে শক্তিশালী করছি কেন!

অন্যদিকে সেই টাকাতেই ব্যবহৃত চীনের প্রযুক্তি ভারতের সুরক্ষার জন্য মারাত্মকভাবে বিপজ্জনক। তাই আমাদের ৫-জির প্রোগ্রাম থেকে হুয়াইকে সম্পূর্ণরূপে বহিষ্কার করতে হবে অনতিবিলম্বে। আমাদের উচিত মোবাইল থেকে প্রথমেই চীনা অ্যাপগুলিকে বিদায় করা। দয়া করে চীনের তৈরি দেবদেবীর মূর্তি ও ধূপবাতির মতো দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় এমন অসংখ্য জিনিসকে ঘরে ঢোকাবেন না। মনে আছে, সাম্প্রতিক দিল্লি দাঙ্গায় কেজরিওয়ালের প্রিয়পাত্র আপনেতা তাহির হুসেনের বাড়ির ছাদ থেকে হিন্দুদের ওপর ছিটানোর জন্য শান্তিজল আর গঙ্গজল লেখা পাত্রগুলিতে পাওয়া গিয়েছিল প্রাণঘাতী গাঢ় সালফিউরিক অ্যাসিড। আজই প্রতিজ্ঞা করুন, চীনকে বাদ দিয়ে অন্য ব্রান্ডের জিনিস কিনব। সম্প্রতি দিল্লিতে ভারতের সাত কোটি ব্যবসায়ীর কনফেডেরশন অব অল ইন্ডিয়ান ট্রেডার্সের সভাপতি প্রবীণ খাণ্ডেলওয়াল বর্জনযোগ্য তিন হাজারের বেশি চৈনিকসামগ্রীর তালিকা প্রস্তুত করেছেন। হিসেবে দেখা গিয়েছে, আগামী ছ'মাসেই চীনের ক্ষতি হবে ১৩ বিলিয়ান ডলার। এই দুর্দিনে আপনি কি ভারতামাতার সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করতে চান না?

দেশপ্রেমের হোমানলে চীনের আগ্রাসন প্রতিহত হবেই

ড. পঙ্কজ কুমার রায়

ভারতীয় সভ্যতা ও চৈনিক সভ্যতা সুপ্রাচীন হওয়া সত্ত্বেও ভারত কখনো পররাষ্ট্র দখলের মানসিকতা পোষণ করেনি কিন্তু চীন তা বার বার লঙ্ঘন করেছে। ১৯৪৭ সাল থেকে কাশ্মীরের সীমান্ত বিবাদ মূলত ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে। এবং চীন এখানে তৃতীয় পক্ষ হিসেবে প্রবেশ করেছে। অক্ষয় চীন (আকসাই চীন) যা বৃহত্তর কাশ্মীরের অংশ পাকিস্তানও ভারতের মধ্যে ম্যাকমোহন লাইন দ্বারা নির্ধারিত হলেও ভারত-চীন সীমান্ত নিয়ে চীনের ক্রমাগত অবস্থান বদলের পরিণতি ১৯৬২-র চীন-ভারত যুদ্ধ। ১৯৫৬ সালে সীমানা নির্ধারণের ক্ষেত্রে চীন গালোয়ান নদীর পূর্বভাগকে প্রকৃত নিয়ন্ত্রণ রেখা হিসেবে স্বীকার করে নেয় (Line of actual control)। পশ্চাশের দশকে চীন তিব্বত দখলের পর বেজিং থেকে তিব্বত পর্যন্ত সড়ক নির্মাণের স্বার্থে লাদাখ ভূখণ্ডের কিছু অংশের প্রয়োজন হয়ে পড়ে এবং তার ফলশ্রুতিতে চীন একতরফা ভাবে গালোয়ান নদীর পূর্বপাড়ে প্রকৃত নিয়ন্ত্রণ রেখা থেকে গালোয়ান নদীর পশ্চিম পাড়ে স্থানান্তরিত করে। ভারতীয় পেট্রলপোস্ট ঘোষণা করেছিল চীনের কোনো সেনা ছাউনি এই অঞ্চলে দেখা যায়নি। এম আই টি-র অধ্যাপক এম টেলার ফ্রাবল অভিমত ব্যক্ত করেন, ‘‘চীন বেজিং-তিব্বত সড়ক সুরক্ষার স্বার্থে পশ্চিম সীমান্তে সামরিক উপস্থিতি বাড়াতে শুরু করে’’।

১৯৬২ সালে চীন ভারতের ভূখণ্ডে ভারতের অধিকারকে অস্বীকার করতে শুরু করে যার পরিণতি হিসেবে ভারতীয় ভূখণ্ডে দেশের পরিকাঠামো উন্নয়ন ও উন্নয়নমূলক কাজ ব্যাহত করতে চীন বদ্ধপরিকর হয়। পাকিস্তান নিজের সার্বভৌমত্ব বিপন্ন করে ১৯৬৩ সাল থেকে ট্রান্স-কারাকোরাম সড়ক ও অক্ষয় চীনে চীনের উপস্থিতিকে স্বীকার করে নিয়েছে। কাশ্মীর ভূখণ্ডে ৫৫ শতাংশ জমি ভারতের মধ্যে, ৩০ শতাংশ পাকিস্তানের দখলে এবং ১৫ শতাংশ চীনের দখলে। পাকিস্তান কেবলমাত্র ভারতীয় ভূখণ্ড দখল করেনি, বরং অবৈধ দখলীকৃত জমির কিছু অংশ চীনকে ব্যবহার করতে দিয়ে এই উপমহাদেশের শান্তি ও সুস্থিতিকে ক্রমাগত বিপন্ন করে তুলেছে। জে এন ইউ-এর আন্তর্জাতিক রাজনীতির অধ্যাপক হ্যাপিমন জেকভ অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, ‘‘চীন পাকিস্তানের সঙ্গে অর্থনৈতিক করিডোর নির্মাণে ৬০ বিলিয়ন ডলারের বেশি বিনিয়োগ করেছে’’। গত বছরে ভারত নিজ ভূখণ্ডে প্রকৃত নিয়ন্ত্রণ রেখার খুব কাছে সব আবহাওয়ার অনুকূল সড়ক নির্মাণ করেছে। লন্ডনের কিংস কলেজের আন্তর্জাতিক সম্পর্কের অধ্যাপক হর্ষ ভি পন্থ মন্তব্য করেন, ‘‘পূর্বে চীন নিজ ভূখণ্ডে সামরিক প্রয়োজনে পরিকাঠামোকে উন্নত করেছে কিন্তু বর্তমানে ভারত সীমান্তরেখা বরাবর পরিকাঠামো আধুনিকীকরণে ব্রতী হয়েছে’’।

২০১৭ সালে ডোকলাম নিয়ে সীমান্ত সমস্যা পরিকাঠামোর উন্নয়নেরই ফলশ্রুতি। ২০২০-তে লাদাখের গালোয়ান উপত্যকায় চীনা সৈন্যের সঙ্গে বিবাদে জড়িয়ে পড়ে ভারতীয় সেনা যা পরবর্তী সময়ে সীমান্ত সংঘর্ষের রূপ নেয় যাতে ১ ভারতীয় সেনা অফিসার-সহ ২০ জন জওয়ান শহিদ হন এবং ১ জন অফিসার সহ ৪৩ জন হানাদার চীনা সেনা নিহত হয়। তা ঘটে ৬ জুনের কোর কমান্ডার পর্যায়ের মিটিং হওয়ার পরে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বেজিংকে হুঁশিয়ারি দিয়ে যথার্থই বলেছেন, ‘ভারত শান্তি চায় কিন্তু প্ররোচনার জবাব দিতে তৈরি’।

চীন ভুলে গেছে তারা যেমন সামরিক শক্তিতে পৃথিবীর তৃতীয় শক্তিশালী দেশ, তেমনি ভারতও চতুর্থ শক্তিশালী দেশ। শক্তির সূচকের নিরিখে প্রথম মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, দ্বিতীয় রাশিয়া, তৃতীয় চীন, চতুর্থ ভারত ও পঞ্চম জাপান। মনে রাখা প্রয়োজন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া ও জাপানের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক চীনের থেকে অনেক বেশি মধুর। চীন পৃথিবীর প্রথম জনবহুল দেশ (১৪৩ কোটি) ও ভারত দ্বিতীয় জনবহুল দেশ (১৩৬ কোটি)। ভারতের সেনা সংখ্যা ২১ লক্ষ ৪০ হাজার ও চীনের ৩৪ লক্ষ। প্রতি বছর সেনাবাহিনীতে অংশগ্রহণকারী যুবক-যুবতীর নিরিখে ভারতবর্ষ যুক্ত করতে পারে ২ কোটি ৩০ লক্ষ যা চীনের ক্ষেত্রে ১ কোটি ৯০ লক্ষ। ভারতে বিধ্বংসী ট্যাঙ্কোর সংখ্যা ৬৪৬৪ এবং চীনের ৯১৫০। ভারতের মিসাইলের সংখ্যা ৫০০০, চীনের ১৩০০০। পারমাণবিক বোমা ভারতের ১২০-১৩০টি, চীনের ক্ষেত্রে তা ২৭০ থেকে ৩০০টি। মনে রাখতে হবে যে, ভারতের যুব জনসংখ্যা চীনের নিরিখে অনেক বেশি, যা ভারতের এক বড়ো শক্তি। করোনাবৃত পৃথিবীর কারণ হিসেবে চীন আজ সকল দেশের কাছে নিন্দিত, কেবল পাকিস্তান ব্যতিরেকে। সর্বোপরি আত্মনির্ভর ভারতের দেশপ্রেমিক জনগণ কালক্রমে অজস্র বহিরাক্রমণকে প্রতিহত করেছে। পার্টি সর্বস্য একনায়কতন্ত্রের ধ্বজা উড়িয়ে পৃথিবীর কোনো শক্তি কখনো দেশপ্রেমকে প্রতিহত করতে পারেনি ও ভবিষ্যতেও তা পারবে না। দেশপ্রেমের হোমানলে চীনের এই আগ্রাসন প্রতিহত হবেই। ২০২০-র নতুন ভারত নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে সঙ্ঘবদ্ধ হয়েছে, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভারতের এই গ্রহণযোগ্যতাকে খাটো করে ১৯৬২ সালের গ্লানি আর চাপিয়ে দেওয়া সম্ভব নয়।

পার্টি সর্বস্য একনায়কতন্ত্রের ধ্বজা উড়িয়ে পৃথিবীর কোনো শক্তি কখনো দেশপ্রেমকে প্রতিহত করতে পারেনি ও ভবিষ্যতেও তা পারবে না। দেশপ্রেমের হোমানলে চীনের এই আগ্রাসন প্রতিহত হবেই।

সূত্র : বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যম।

(লেখক কলকাতার যোগেশ চন্দ্র চৌধুরী কলেজের অধ্যক্ষ)

ভারতের প্রতি চীনের ঐতিহাসিক শত্রুতা এবং ভারতবাসীর দায়িত্ব

অম্লানকুসুম ঘোষ

গত ১৭ জুন মধ্যরাত্রে চীনা সেনা নৃশংস আক্রমণ চালিয়ে ভারতের কুড়িজন বীর সৈনিকের জীবনহানি ঘটিয়েছে। ভারতের বীর জওয়ানরাও অবশ্য এর যোগ্য প্রত্যুত্তর দিয়েছে।। চীনের সঙ্গে ভারতের দ্বিপাক্ষিক চুক্তি অনুযায়ী চীন-ভারত সীমান্তে আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করে না দু'পক্ষের সেনাবাহিনীই। সেই নিয়ম অনুযায়ী ভারতীয় সৈন্যবাহিনী নিরস্ত্র ছিল। নিরস্ত্র ছিল চীনা সৈন্যবাহিনীও। কিন্তু তাদের হাতে ছিল কাঁটা লাগানো গদা। সেই গদার আঘাতেই তারা হত্যা করেছে ভারতের কুড়ি জনকে। চীনের এই নৃশংসতায় গোটা বিশ্ববাসী আজ স্তম্ভিত।

ভারত সীমান্তে চীনের হামলা অবশ্য আজ নতুন নয়। অতীতেও এর নজির রয়েছে এবং সেই উদাহরণ খুব সুখকর নয়। ১৯৫০ সালেই ভারত ও চীনের একমাত্র মধ্যবর্তী দেশ (বাফার স্টেট) তিব্বতকে আক্রমণ করে গ্রাস করে চীন। স্বাধীনতার পর 'হিন্দি-চীনি ভাই ভাই' নীতিতে বুঁদ হয়ে থাকা আমাদের রাষ্ট্রপ্রধান কান দেননি চীনা ড্রাগনের আক্রমণে বিপন্ন তিব্বতের আর্তচিৎকারে। চীনের আগ্রাসনের হাত থেকে রক্ষা করেননি প্রতিবেশী বন্ধুদেশ তিব্বতকে। ফল ফলতে দেরি হয়নি, তিব্বতকে দখল করার ফলে চীনের সঙ্গে ভারতের সরাসরি সীমানা স্থাপিত হয়েছিল। আগ্রাসী প্রবৃত্তি অনুযায়ী চীন সীমানা লঙ্ঘন করে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল ভারতের ওপর ১৯৬২ সালে। তৎকালীন নিষ্ক্রিয় ভারত সরকার ব্যর্থ হয়েছিল সেই আক্রমণকে ঠেকাতে। চীন দখল করেছিল ভারতের ৬২ হাজার বর্গকিলোমিটার ভূখণ্ড। সেই বিপুল পরিমাণ ভূখণ্ডের গুরুত্ব অনুধাবন করতে ভুল করেছিলেন তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু। বিরোধীদের প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেছিলেন, 'Not a bled of grass grows there' (সেখানে তো একটা ঘাসও গজায় না, অর্থাৎ কৃষিকাজ হয় না)। কিন্তু তার গুরুত্ব ছিল অন্য জায়গায়, সমভূমিপ্রধান ভারত এবং মরুভূমিপ্রধান চীনের মধ্যে প্রাকৃতিক প্রাচীর নির্মাণকারী হিমালয় নিজের ভূপ্রাকৃতিক অবস্থানের কারণেই বিশাল সামরিক গুরুত্বের অধিকারী। এখন সেই সামরিক সুবিধা ষোলো আনা উশুল করছে চীন। হিমালয়ের ওপরে অপেক্ষাকৃত উঁচু স্থানে প্রচুর পরিমাণ সমরোপকরণ মজুত এবং সমরোপযোগী পরিকাঠামো নির্মাণ করেছে চীন। প্রতি বছরে শতাধিক বার তারা ভারতের সীমান্ত অতিক্রম করছে। হিমালয়ের উচ্চস্থান চীনের হাতে ছেড়ে অপেক্ষাকৃত নিম্নভূমিতে অবস্থানরত ভারত সেই অনুপ্রবেশসমূহ ঠেকাতে প্রতি বছর খরচ করে কয়েক হাজার কোটি টাকা। ঘাস না গজানো সেই কয়েক হাজার বর্গকিলোমিটার এলাকা ভারতের হাতে থাকলে সেই বার্ষিক অর্থব্যয় ভারতের না হয়ে চীনের হতো।

শুধুমাত্র সামরিক গুরুত্বই নয়, এই জায়গাটির অর্থনৈতিক গুরুত্বও যথেষ্ট। বর্তমানে সারা বিশ্বে পানীয় জলের ব্যবসা প্রায় কুড়ি হাজার কোটি ডলারের (টাকার মূল্যে প্রায় ১৫ লক্ষ কোটি টাকা)। অর্থনৈতিক

বিশ্লেষকদের মতে এর পরিমাণ আগামীদিনে আরও বাড়বে তীব্র গতিতে। বর্তমানে অর্থনৈতিক বিশ্ব যদি খনিজ তেলের হয় তাহলে আগামী অর্থনৈতিক বিশ্ব হবে পানীয় জলের। পানীয় জলের দ্বিতীয় বৃহত্তম ভাণ্ডার (পানীয় জলের বৃহত্তম ভাণ্ডার কুমেরু কোনও একটি দেশের অধিকৃত নয়, রাষ্ট্রপুঞ্জের সরাসরি আওতায়) হিমালয় নিজের হাতে থাকায় সেই অনাগত আগামীতে চীন বিশ্ব অর্থনীতিতে কী বিপুল সুবিধা পাবে এবং হিমালয় হস্তচ্যুত হওয়ায় আগামীর ভারত বিশ্ব অর্থনীতিতে কী বিপুল সুবিধা পাওয়া থেকে বঞ্চিত হবে তা চিন্তার বাইরে। এখানেই শেষ নয়, নদীমাতৃক ভারতবর্ষের প্রধান তিনটি নদনদীর অন্যতম ব্রহ্মপুত্রের উৎস সেই সময় থেকে চীনের দখলে। ইতিমধ্যেই সেই উৎসের পরবর্তী অংশে তারা বাঁধ নির্মাণ করেছে। যে কোনও মুহূর্তে তারা ব্রহ্মপুত্রের গতিপথ পরিবর্তন করে দিতে পারে। সেক্ষেত্রে অসম-সহ সমস্ত উত্তর-পূর্ব ভারত সংকটাপন্ন হবে।

আগ্রাসী চীন কিন্তু এতেই সন্তুষ্ট নয়। হিমালয়ের বাকি অংশ এবং অরুণাচল প্রদেশ-সহ সমস্ত উত্তর-পূর্ব ভারত তারা ছলে-বলে- কৌশলে দখল করতে চায়। হিমালয়ের বুকে অবস্থিত ঐতিহাসিক ভারতবন্ধু নেপাল আজ চীনের কৌশলে এবং পূর্বতন ভারত সরকারের উদাসীনতায় বর্তমানে কমিউনিস্ট প্রভাবিত হয়ে চীনের করালগ্রাসে। হিমালয়ে অবস্থিত আরেক ভারতবন্ধু ভুটান চীনের কৌশলের কাছে নতি স্বীকার না করায় সেখানে বল প্রয়োগের আশ্রয় নিয়েছিল তারা।

পরিস্থিতি আজও সেই একই। পঞ্চাশের দশকে আক্রান্ত হয়েছিল বন্ধুদেশ তিব্বত। ২০১৭ সালে আক্রান্ত হয়েছিল ভুটান। এবারে আক্রান্ত হয়েছি সরাসরি আমরা। এবারকার মতো ভারত সরকারের হুঁশিয়ারিতে চীন পশ্চাদপসরণ করেছে। তা বলে কর্তব্যকর্ম বিস্মৃত হলে হবে না। সেদিনের মতো আজও যদি কর্তব্যকর্মে বিস্মৃত হই আমরা, তাহলে আগ্রাসী ড্রাগনের মুখগহ্বর আমাদের ছেড়ে কথা বলবে না। বিবাদ শুধমাত্র লাদাখ সীমান্তে সীমাবদ্ধ থাকবে না, আমাদের উত্তরবঙ্গ সংলগ্ন সিকিম সীমানায়ও তারা আক্রমণ করবে। এবং তার পাশাপাশি উত্তর-পূর্ব ভারতের সঙ্গে অবশিষ্ট ভারতের যোগাযোগের একমাত্র পথটিকেও (দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং নিয়ে গঠিত 'চিকেন নেক' আনবে নিজের অধিকারে। উত্তর-পূর্ব ভারতের সঙ্গে অবশিষ্ট ভারতের যোগাযোগ বিনষ্ট হবার ফলে জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষেত্র অরুণাচল প্রদেশ যাবে তাদের অধিকারে।

এ প্রসঙ্গে বলা যায়, অরুণাচল প্রদেশ-সহ সমগ্র উত্তর-পূর্ব ভারতেও নেহরুর কোনো লক্ষ্য ছিল না। এখানকার ভূপ্রকৃতি পাহাড়ি ঢালবিশিষ্ট হওয়ায় কৃষিতে এই অঞ্চল খুব পিছিয়ে। কিন্তু উত্তর-পূর্ব ভারতের গুরুত্ব অন্য জায়গায়। হিমালয়ের ঠিক প্রান্তদেশে অবস্থিত এই অঞ্চলটি হিমালয়ের বরফ গলা জলে সমৃদ্ধ থাকে সারা বছর। পাহাড়ি ঢাল বরাবর সেই জল প্রচণ্ড গতিতে নিম্নমুখী হয়। ফলে জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষেত্রে অরুণাচল প্রদেশ-সহ সমগ্র উত্তর-পূর্ব ভারত সোনার খনিসদৃশ। বিশেষজ্ঞদের মতে শুধুমাত্র অরুণাচল প্রদেশেই বছরে এক লক্ষ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদিত হতে পারে, সমগ্র উত্তর-পূর্ব ভারত মিলিয়ে পরিমাণ আরও বেশি হতে পারে। আজ ক্রমক্ষয়িষ্ণু খনিজ তেলের ভাণ্ডারের ওপর এবং ক্রমক্ষয়িষ্ণু খনিজ কয়লাজাত তাপবিদ্যুতের ওপর নির্ভরশীল গোটা বিশ্বের শিল্প ও পরিষেবা ক্ষেত্র যখন বিকল্প শক্তির সন্ধানরত, তখন এই বিপুল পরিমাণ জলবিদ্যুৎ ভারতীয় অর্থনীতির এক চিরস্থায়ী সম্পদে পরিণত হতে পারে। কিন্তু চীনের আগ্রাসী নীতির কারণে সেই সম্ভাবনা বাস্তবায়িত হচ্ছে না।

চৈনিক আগ্রাসন শুধুমাত্র সিকিম, লাদাখ ও উত্তর-পূর্ব ভারতে আবদ্ধ থাকবে তা নয়, তারা আক্রমণ করবে কাশ্মীর সীমান্তে, আর এখানে তাদের দোসর হবে তাদেরই প্রদেয় অস্ত্র ও অর্থে বলীয়ান পাকিস্তান। কাশ্মীরের ওপর পাকিস্তান ও চীনের লোলুপদৃষ্টি আজকের নয়, স্বাধীনতার পর থেকেই মধ্য এশিয়ার সঙ্গে ভারতের স্থলপথে যোগাযোগের একমাত্র মাধ্যম কাশ্মীরকে ভারতের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা চলেছে এবং সেই কাজ করছে চীনপ্রদত্ত অর্থবলে ও অস্ত্রবলে।

চীন তার অথবর্ল ও অস্ত্রবলে শুধুমাত্র নিজেদের, পাকিস্তানের সেনাবাহিনীর এবং সন্ত্রাসবাদীদের দ্বারা যে শুধুমাত্র ভারতের সীমান্তেরই ক্ষতি করছে তা নয়, সেই অর্থ ও অস্ত্রবল ভারতের অভ্যন্তরেও লাগানো হচ্ছে ভারতের ক্ষতি করার জন্য। মূলত কৃষিপ্রধান ভারত খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ। ভারতের প্রায় আশিটি এমন জেলা আছে যে জেলাগুলি বিভিন্ন খনিজ পদার্থে সমৃদ্ধ। জেলাগুলি মূলত মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড়, ঝাড়খণ্ড, ওড়িশা,

পশ্চিমবঙ্গ, মহারাষ্ট্র, কর্ণাটক ও বিহারের কিছু অংশে অবস্থিত। এই খনিজ পদার্থের সঠিক ব্যবহার করা সম্ভব হলে ভারত শিল্পে পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ দেশে পরিণত হতো। কিন্তু ভারত শিল্পে স্বয়ম্ভর হলে চীনের বাজার নষ্ট হবে, চীন তার উৎপাদিত পণ্য ভারতে রপ্তানি করতে পারবে না। তাই চীন ভারতের শিল্পক্ষেত্রের এই বিপুল সম্ভাবনাকে নষ্ট করার জন্য এই জেলাগুলিতে মাওবাদীদের অর্থ ও অস্ত্র দ্বারা সাহায্য করছে। চীন প্রদত্ত অর্থ ও অস্ত্রবলে বলীয়ান মাওবাদীরা এই সমস্ত এলাকায় এমন অশান্তির পরিবেশ তৈরি করেছে যে এখানে ন্যূনতম পরিকাঠামো তৈরি করতে ব্যর্থ হয়েছে দেশের শাসনব্যবস্থা। ফলে ভারতের শিল্পে উন্নত হওয়ার সম্ভাবনা বাস্তবায়িত হচ্ছে না।

ভারতের শিল্পোন্নয়নের সমস্ত সম্ভাবনাকে চীন অঙ্কুরেই বিনষ্ট করতে চায়। ভারতকে তার উৎপাদিত পণ্যের বাজার এবং কাঁচামাল সরবরাহকারী দেশ হিসেবে রেখে দিতে চায়, ঠিক ঔপনিবেশিক আমলের ব্রিটিশের মতো। বস্তুত, পলাশীর যুদ্ধের আগের মানদণ্ডধারী ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বণিকের সঙ্গে আজকের চীনের কার্যপদ্ধতির অদ্ভুত সাদৃশ্য।

ভারতের সঙ্গে এই সর্বাত্মক শত্রুতা চীন শুধু ভারত সীমান্তে ও অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে করছে তাই নয়, বিশ্ব রাজনীতিতেও চীন ভারতের প্রতি একইরকম বৈরী ভাবাপন্ন। রাষ্ট্রপুঞ্জের নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্যপদের জন্য ভারতকে মনোনীত করা হয়েছিল। কিন্তু চীন ভেটো প্রয়োগ করে ভারতকে সেই মর্যাদা থেকে বঞ্চিত করেছে। কূটনীতি জগতের নির্মম পরিহাস হলো, চীন নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য হয়েছে এবং তজ্জনিত কারণে ভেটো প্রয়োগের অধিকারী হয়েছে ভারতেরই দয়ায়।

দুঃখজনক হলেও সেই ইতিহাসকে একটু স্মরণ করা যাক। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসানে ১৯৪৫ সালে রাষ্ট্রপুঞ্জ স্থাপিত হয়। বিশ্বযুদ্ধজয়ী চার দেশ অর্থাৎ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইংল্যান্ড, সোভিয়েত ইউনিয়ন ও ফ্রান্স রাষ্ট্রপুঞ্জের নিরাপত্তা পরিষদের চার সদস্য দেশ হিসেবে ভেটো প্রয়োগের অধিকার লাভ করে। ১৯৫৫ সালে রাষ্ট্রপুঞ্জ ঠিক করে বিশ্বের বৃহত্তম মহাদেশ এশিয়ার একটি দেশকে নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য করা হবে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে বিধ্বস্ত জাপান তখন এশিয়ার প্রথম সারির দেশ হিসেবে গণ্য হতো না। এশিয়ার বৃহৎ দুই দেশ ভারত ও চীনের মধ্যে যে কোনও একটি দেশকে রাষ্ট্রপুঞ্জের নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য করার কথা পরিষদে গৃহীত হয়। কমিউনিস্ট চীনকে সমর্থন করে কমিউনিস্ট সোভিয়েত ইউনিয়ন আর গণতান্ত্রিক দেশ ভারতকে সমর্থন করে গণতান্ত্রিক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইংল্যান্ড ও ফ্রান্স। সংখ্যাধিক্যে জয়ী ভারত তখন রাষ্ট্রপুঞ্জের নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য কিন্তু ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী সেই স্থায়ী সদস্যপদ গ্রহণ না করে চীনকে সেই পদ ছেড়ে দেন। কৃতঘ্ন চীন সেই উপকারেরই প্রতিদান দিচ্ছে আজ ভারতের বিরুদ্ধেই ভেটো প্রয়োগ করে। অর্থাৎ বলা যায় অর্থনীতিকে সমৃদ্ধতর করার জন্য যে যে উপাদানের প্রয়োজন হয়, সেই উপাদানগুলি প্রচুর পরিমাণে থাকা সত্ত্বেও আমরা নিজেদের অর্থনীতিকে উন্নত করতে পারছি না চীনের জন্য। চীনের জন্যই কাশ্মীর থেকে সম্ভাব্য প্রাপ্য বিপুল বৈদেশিক মুদ্রার ভাণ্ডার আমাদের হস্তচ্যুত। চীনের জন্যই মধ্য ভারত থেকে সম্ভাব্য প্রাপ্য বিপুল খনিজ সম্পদের ভাণ্ডার আমাদের হস্তচ্যুত। সেই কারণেই আমাদের দেশের উন্নত মেধা আজ ব্রেন ড্রেনের মাধ্যমে বিদেশাভিমুখী।

এখন প্রশ্ন হলো, চীন এত কিছু করছে কীভাবে? চীন এত শক্তি পাচ্ছে কোথা থেকে? অত্যন্ত দুঃখের হলেও একথা সত্যি যে চীন এই শক্তি পাচ্ছে আমার আপনার পকেটের টাকা থেকেই। সাধারণ ভারতীয় ক্রেতা সস্তার মোহে পড়ে ভারতীয় পণ্যের বদলে চীনা পণ্য কিনে ফেলেন, আর এর মাধ্যমেই প্রচুর পরিমাণ অর্থ ভারত থেকে প্রতি বছর চীনে চলে যায়। গত অর্থবর্ষে চীনের সঙ্গে ভারতের মোট বাণিজ্যের পরিণাণ ছিল প্রায় ৭০.৮ বিলিয়ন ডলার বা পাঁচ লক্ষ তেইশ হাজার ন'শো কুড়ি কোটি টাকা। এর মধ্যে ৬১.৮ বিলিয়ন ডলার বা ৪ লক্ষ ৫৭ হাজার ৩২০ কোটি টাকা হলো চীন থেকে ভারতে হওয়া আমদানি এবং মাত্র ৯ বিলিয়ন ডলার বা ৬৬ হাজার ৬০০ কোটি টাকা হলো ভারত থেকে চীনে হওয়া রপ্তানি। অর্থাৎ বাণিজ্য ঘাটতি হলো ৫২.৮ বিলিয়ন ডলার বা ৩ লক্ষ ৯০ হাজার ৭২০ কোটি টাকা। চীনের থেকে ভারতের আমদানির মধ্যে পেট্রোলিয়াম নেই, তবু এই বিপুল বাণিজ্য ঘাটতির কারণ চীনে নির্মিত সস্তা পণ্যের ভারতীয় বাজারে ব্যাপক বিক্রি হওয়া। কারও কারও মনে প্রশ্ন জাগতে পারে যে, চীনা জিনিস ব্যবহার করা যদি দেশের পক্ষে এতই ক্ষতিকর, তাহলে সরকার চীনা জিনিস ব্যবহার আইন করে বন্ধ করে দিচ্ছে না কেন? বর্তমানে বিশ্বায়নের পৃথিবীতে আন্তর্জাতিক নিয়মানুসারে কোনও দেশই কিন্তু একটি বিশেষ দেশের সব পণ্য বিক্রি আইনত নিষিদ্ধ করতে পারে না।

তাহলে সমাধান কোথায়? সমাধান আছে। আমাদের বীর সেনারা সীমান্তে সংগ্রাম করবেন, কিন্তু অসামরিক জনসাধারণেরও দায়িত্ব আছে। ভারত-বিরোধী সব কাজই চীন করছে এবং করবে আমাদের দেশে বিক্রিত চীনা পণ্যের মূল্যবাবদ প্রাপ্ত অর্থ থেকেই। তাই জনসাধারণ যদি চীনের পণ্য না কেনেন তাহলে অর্থাভাবে চীন ভারত-বিরোধী কাজ করা থেকে বিরত থাকবে। ভারত সরকার চীনের সামগ্রী বিক্রি নিষিদ্ধ না করতে পারলেও কোনও বস্তু কেনা বা না কেনা তো সম্পূর্ণ ক্রেতার হাতে। চীনা পণ্যে ভারতীয় বাজার ছেয়ে গেলেও চীনা পণ্য কিনবো কী কিনবো না সেই সিদ্ধান্ত তো সম্পূর্ণরূপে ক্রেতার নিজের। ক্রেতারা যদি চীন পণ্য না কেনেন, তাহলে বিশ্বায়ন সংক্রান্ত আইনসমূহও চীনের পণ্যকে ভারতের বাজার দখল করার সুযোগ দিতে পারবে না।

মনে হতে পারে এতবড়ো এক আন্তর্জাতিক শক্তি চীন, তারা আমাদের দেশের ওপর আগ্রাসন চালাচ্ছে, শুধুমাত্র বয়কটকে অস্ত্র করে আমরা সাধারণ মানুষ কি পারবো এত বড়ো এক শক্তির সঙ্গে লড়াই করতে? করা যে যায়, তার প্রমাণ পাওয়া যাবে ইতিহাসের দিকে একটু তাকালেই। ১৯০৫ সাল ব্রিটিশ সরকার ঘোষণা করলো বঙ্গভঙ্গ। শক্তিশালী ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের একটি 'Settled Fact' (স্থিরীকৃত সিদ্ধান্ত)-কে ভারতবাসী 'Unsettled' করে দিয়েছিল শুধুমাত্র ব্রিটিশ পণ্য বয়কট করার মাধ্যমে। শুধুমাত্র ভারতীয়রা ব্রিটিশ পণ্য বয়কট করা শুরু করতেই টনক নড়েছিল ব্রিটিশ সরকারের। বাধ্য হয়েছিল তারা পশ্চাদপসরণ করতে। এতে বঙ্গভঙ্গ প্রতিহত হয়েছিল। সেদিন দরিদ্র পরাধীন অস্ত্রহীন ভারতবাসী যা করতে পেরেছিল আজ অর্থনৈতিক দিক দিয়ে বিশ্বের পঞ্চম এবং সামরিক শক্তির দিক দিয়ে বিশ্বের সপ্তম শক্তিধর দেশের নাগরিক ভারতবাসী আমরা কি তা করতে পারবো না? অবশ্যই পারবো, যদি সেদিনের মতো আজও আমরা মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নিতে পারি। যদি সেদিনের মতো আজও দেশপ্রেমের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করতে পারি তবেই আমরা চীনের আগ্রাসনকে সম্পূর্ণরূপে রুখে দিতে পারবো। ■

রক্তাক্ত ভারত ও হানাদার চীন

অনু বর্মণ

ফ্রান্সের অদ্বিতীয় সমরানায়ক ও সম্রাট নেপোলিয়ন বোনাপার্ট বলেছিলেন, 'চীন হলো ঘুমন্ত দানবী। ওকে ঘুমতে দাও, ও জেগে উঠলে জেগে উঠলে পৃথিবী কাঁপিয়ে দেবে'। আজ যেন সত্যিই জেগে উঠেছে আগ্রাসী চীন। করোনার আঁতুড়ঘর চীন আজ বিশ্বের কাছে একঘরে । শান্তিপ্রিয় ভারতবর্ষের বিকাশ এই হিংস্র দানবীর চক্ষুশূল। আগ্রাসী চীনের মোকাবিলা করতে গিয়ে শহিদ হলেন ভারতের একজন কর্নেল-সহ ২০ জন সেনা জওয়ান। অবশ্য ভারতীয় জওয়ানরাও সাহসের সঙ্গে এর যোগ্য জবাব দিয়েছেন।

ঘটনার সূত্রপাত ১৬ জুন সোমবার রাতে সেনা প্রত্যাহার করার সময়। দুই পক্ষের সেনা পর্যায়ে আগে যে পরপর বৈঠক হয়েছিল সেই বোঝাপড়া অনুযায়ী নিয়ন্ত্রণরেখা থেকে সেনা প্রত্যাহার করছিল দুই পক্ষই। সেই সময় পিপলস লিবারেশন আর্মির কয়েকজন ভারতীয় সেনাদের বিরুদ্ধে ভাঙা ভাঙা হিন্দি এবং ইংরেজিতে উস্কানিমূলক মন্তব্য করছিল। কয়েকজন ভারতীয় সেনা এই ঘটনার প্রতিবাদ করলে চীনারা রড, কাঁটাতার, শাবল নিয়ে হামলা চালায়। তারপর শুরু হয় তীব্র খণ্ডযুদ্ধ। সংঘর্ষের পরে দেখা যায় ভারতীয় কর্নেল (সন্তোষবাবু), জুনিয়র কমিশনড অফিসার ও এক জওয়ানের প্রাণহীন দেহ পড়ে রয়েছে। উল্টোদিকে পড়ে রয়েছে রক্তাক্ত কয়েকজন চীনা সেনার লাশ।

পূর্ব লাদাখের গালওয়ান উপত্যাকায় প্রকৃতি নিয়ন্ত্রণ রেখার কাছে এই সংঘর্ষ যেন চীনের পূর্ব নির্ধারিত এক কৌশলমাত্র। এই ঘটনার নেপথ্য রয়েছে নবনির্মিত ২৫৫ কিলোমিটার রাস্তা। লাদাখের দরবুক থেকে দৌলতবেগ ওল্ডি (ডিবিও) পর্যন্ত ২৫৫ কিলোমিটার রাস্তা তৈরির কাজ শুরু হতেই চীন অসন্তুষ্ট। এই রাস্তা অত্যন্ত 'ডিভিকাল্ট টেরেইন'-এ ভারতীয় সেনাবাহিনীকে সাহায্য করবে। এক্ষেত্রে মনে রাখা প্রয়োজন ১৬৬১৪ ফুট উচ্চতায় পৃথিবীর সর্বোচ্চ এয়ারস্ট্রিপ হচ্ছে দৌলতবেগ ওল্ডি। এই রাস্তাটি 'অল ওয়েদার রোড'। শীতকালে প্রবল তুষারপাত্যে রাস্তা দিয়ে যান চলাচল করতে পারবে, শুধু জমে থাকা বরফ সরিয়ে নিতে হবে। গত বছর এই রাস্তাতেই শিয়ক নদীর উপরে

নির্মিত একটি ব্রিজ উদ্বোধন করেছেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিংহ। এই রাস্তার একদিকে আছে চীনা অচল, অন্যদিকে ২০ কিলোমিটার দূরে আছে কারাকোরাম হাইওয়ে ও চীন-পাক ইকোনমিক করিডর। আগে যেখানে আর্মি বেস থেকে দুর্গম অঞ্চলে রিজার্ভ ফোর্সের পৌঁছতে সময় লাকত ২৮ ঘণ্টা, এখন সেখানে মাত্র ৩ ঘণ্টা সময় লাগে। চীন ভারতের এই দাপট মেনে নিতে পারছে না।

২০১৭ সালে ডোকলাম কাণ্ডের মূল কারণ ছিল প্রকৃত নিয়ন্ত্রণ রেখার সন্নিকটে চীনের তৈরি ১২ কিলোমিটার লম্বা রাস্তা। ভারত তীব্র প্রতিবাদ জানায়। দু'দেশের মধ্যে উত্তেজনা বজায় থাকে ৭৩ দিন। টানা ৬ সপ্তাহ আলোচনার পর সরে আসে দুপক্ষই।

অতিতে বহুবার চীন তার আগ্রাসী মনোভাবের স্বাক্ষর রেখেছে। ১৯৬২ লালে একাযোগে লাদাখ এবং অরুণাচল প্রদেশে হানা দিয়েছিল লালফৌজ। এই যুদ্ধে ৩২৫০ জন ভারতীয় জওয়ান শহিদ হয়েছিলেন। টানা এক মাসের এই যুদ্ধে আকসাই চীন হাতছাড়া হয়েছিল ভারতের। আজও এই ভূখণ্ড ভারত ফেরত পায়নি। এই ভূখণ্ড ১৮৬৫ সালে ব্রিটিশ বিশেষজ্ঞ ডব্লিউ এইচ জনসনের সীমারেখা অঙ্কনের মাধ্যমে ভারত পেয়েছিল। যা 'জনসন লাইন' লে পরিচিত। ১৯৫১ সাল থেকেই এখানে সড়ক নির্মাণ নিয়ে ভারত-চীন বিরোধ সৃষ্টি হয়। ১৯৬২ সালের এই যুদ্ধের প্রকৃত সত্য জানার জন্য নিয়োগ করা হয়েছিল তদন্ত কমিটি। কমিটির প্রধান হেন্ডারসন ব্রুকস রিপোর্ট জমা দেন তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুকে। এই রিপোর্ট পড়ে নেহরু রিপোর্টটি তালা বন্ধ করার নির্দেশ দেন। আজও এই রিপোর্ট প্রকাশিত হয়নি। রাহুল গান্ধী এই রিপোর্ট প্রকাশ করার জন্য সরব হবেন কী?

১৯৬৭ সালে ঘটে লাথুলা সংঘাত। সিকিমে চীনা অনুপ্রবেশ রুখতে কাঁটাতারের বেড়া দিচ্ছিলেন ভারতীয় জওয়ানরা। তখনই তাদেল লক্ষ্য করে গুলি চালায় লালফৌজ। পাল্টা জবাবে ভারত গুঁড়িয়ে দেয় চীনা বাঙ্কার। ফলে মারা যায় তিনশোর বেশি চীনা সৈনিক। ভারতীয় সেনাবাহিনীর প্রতিরোধে চো লা সংঘাতে লালফৌজ পিছু হটলেও মারা যান ৪৪ জন ভারতীয় জওয়ান। ১৯৭৫ সালের ২০ অক্টোবর অরুণাচল প্রদেশের টুং লা এলাকায় অসম রাইফেলসের টহলদার বাহিনীর উপর হামলা চালিয়ে চাল জওয়ানকে মেরেছিল চীনা সেনা। ১৯৮৭ সালে অরুণাচল প্রদেশকে পূর্ণাঙ্গ রাজ্যের মর্যাদা দিতেই চীন ফের ঝামেলা শুরু করল। অরুণাচল প্রদেশে ঢুকে হেলিপ্যাড বানাতে শুরু করল চীন। ভারতীয় বায়ুসেনা বাধা দেয়। এরপর আলোচনার মাধ্যমে সংঘাত বিরতিতে যায় দুপক্ষ। অরুণাচল প্রদেশ ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ। তবুও বিভিন্ন অজুহাতে চীন সময়ে সময়ে তার গাত্রদাহ প্রকাশ করে।

সম্প্রতি নেপালের মানচিত্রে পরিবর্তন সংক্রান্ত ঘটনায় উস্কানি রয়েছে চীনের। চীনের এই বিশ্বাসঘাতকতার ইতিহাস এবং আগ্রাসী মনোভাব নিয়ে ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির ভূমিকা সত্যিই লজ্জাজনক। ১৯৬২-র যুদ্ধে চীনের বিরুদ্ধে মুখে কুলুপ এঁটেছিল তদানীন্তন ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি। এবার লাদাখের লাল সন্ত্রাস নিয়ে সিপিএম পলিটব্যুরোর বিবৃতিতে তারই হুবহু প্রতিফলন। দ্বিপাক্ষিক উত্তেজনা প্রশমনে ও শান্তি স্থাপনে কেন্দ্রের কী করা উচিত, সে ব্যাপারে তাত্ত্বিক পরামর্শ থাকলেও চীনা আগ্রাসনের বিষয়টি সন্তর্পণে এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে। স্পর্শকাতর প্রসঙ্গটি নিয়ে বঙ্গ সিপিএমের নেতারা একটি শব্দও খরচ করতে নারাজ। মুখ খোলার দায়িত্ব পার্টির কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের উপরই ছেড়ে দিয়েছে অলিমুদ্দিন।

প্রশ্ন হলো করোনা আক্রান্ত এই বিধ্বস্ত সময়ে চীন কেন এরকম আচরণ করল? বিশেষজ্ঞদের মতে করোনাকে কেন্দ্র করে চীনের বিশ্বাসযোগ্যতা এক বিরাট প্রশ্নচিহ্নের মুখে। ২০১৯ সালের ৫ আগস্ট নয়াদিল্লির ৩৭০ ধারা রদ এবং লাদাখকে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল ঘোষণা পাকিস্তানের গালে এক উত্তর চপেটাঘাত। পাকিস্তানের প্রাণসখা চীন নয়াদিল্লির এই সুদূরপ্রসারী পদক্ষেপকে সহজে মেনে নিতে পারেনি। উত্তরকোরিয়া, দক্ষিণকোরিয়া, ইজরাইল, প্যালেস্তাইন প্রভৃতি বিবদমান দেশগুলি কোথাও ঝামেলা করছে না কিন্তু চীন ব্যাতিক্রম। আমেরিকা প্রকাশ্যে চীন সম্পর্কে কঠোর মনোভাব গ্রহণ করেছ। জাপান সরকার জাপানি ব্যবসায়ীদের চীন থেকে তাদের বিনিয়োগ প্রত্যাহার করার অনুরোধ জানিয়েছেন। অন্যদিকে, করোনা নিয়ে চীনের ভূমিকা তদন্তের জন্য আন্তর্জাতিক চাপ বাড়ছে। ঘটনাচক্রে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তদন্ত কমিটির প্রধান ভারতের স্বাস্থ্যমন্ত্রী। এছাড়া হংকংয়ের পরিস্থিতি নিয়েও সচেতন, সুপরিকল্পিত, ঘৃণ্য পদক্ষেপ। চীনের বহু বর্ষব্যাপী ষড়যন্ত্রের বীজ লুকিয়ে আছে মাও জে দং-এর একটি মন্তব্যের মধ্যে। ১৯৫০ সালে চীন সামরিকভাবে তিব্বত দখলের পর মাও জে দং মন্তব্য করেছিলেন 'তিব্বত চীনের হাতের তালু, লাদাখ, নেপাল, সিকিম, ভূটান এবং নেফা (বর্তমান অরুণাচল প্রদেশ) তার হাতের আঙুল'। তাই কড়া হাতে চীনের আগ্রাসনকে রুখতে হবে নয়তো গালওয়ানের মতো সংঘর্ষের ঘটনা ফের হওয়ার আশঙ্কা থাকছে। ■

একটি আবেদন

আপনারা সকলেই জানেন যে, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের স্বর্গগত প্রচারক শ্রদ্ধেয় বসন্তরাও ভট্ট (জন্ম : ১৮ ফেব্রুয়ারি, ১৯২৬, প্রয়াণ : ২৬ এপ্রিল, ২০১৩) পশ্চিমবঙ্গে ১৯৫৬ থেকে ১৯৭৭ পর্যন্ত বিভাগ প্রচারক, প্রান্ত প্রচারক হিসাবে কাজ করেছেন। তারপর সঙ্ঘের যোজনায় ১৯৭৭ থেকে আমৃত্যু পশ্চিমবঙ্গ, সম্পূর্ণ উত্তর-পূর্বাঞ্চল, সিকিম, আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে এবং সারা ভারতের জনজাতি সমাজের সর্বাঙ্গীণ উন্নয়নে অখিল ভারতীয় বনবাসী কল্যাণ আশ্রমের ক্ষেত্রীয় সংগঠন সম্পাদক ও সর্বভারতীয় সহ-সম্পাদকের দায়িত্ব সফলতার সঙ্গে নির্বাহ করেছেন। খ্রিস্টান মিশনারী ও সন্ত্রাসবাদ কবলিত উত্তর-পূর্বাঞ্চলে জনজাতিদের স্বধর্ম, নিজস্ব সংস্কৃতি রক্ষায় এক ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছেন।

সঙ্ঘ এবং কল্যাণ আশ্রমের অখিল ভারতীয় স্তর থেকে আরম্ভ করে সাধারণ যে সকল কার্যকর্তা তাঁর সঙ্গে কাজ করেছেন, এরকম প্রায় দেড় শতাধিক কার্যকর্তার অভিজ্ঞতার বিবরণ তাঁদের লেখনিতে লিপিবদ্ধ একটি সংস্মরণ স্মারিকা গ্রন্থাকারে শীঘ্রই পূর্বাঞ্চল কল্যাণ আশ্রমের পক্ষ থেকে প্রকাশিত হতে চলেছে। যা সকল সামাজিক-সার্বজনিক জীবনে কর্মরত সকলকে প্রেরণা ও উৎসাহ প্রদান করবে।

সংরক্ষণযোগ্য এই গ্রন্থটির মূল্য একশত পঁচিশ টাকা। কিন্তু প্রকাশনপূর্ব মূল্য একশত টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। সঙ্ঘ কার্যালয় কেশব ভবন, উত্তরবঙ্গের মাধব ভবন, কল্যাণ আশ্রম কার্যালয় কল্যাণ ভবন ছাড়াও কল্যাণ আশ্রমের সকল ছাত্রাবাস ও ছাত্রীনিবাসে যে কেউ আগামী ১৫ আগস্ট পর্যন্ত একশত টাকা ও নাম ঠিকানা, মোবাইল নম্বর লিখিয়ে গ্রাহক হতে পারবেন।

শ্রী অদ্বৈতচরণ দত্ত
রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ

শ্রী বিশ্বনাথ বিশ্বাস
পূর্বাঞ্চল কল্যাণ আশ্রম

প্রচ্ছদ নিবন্ধ

চীনাপণ্য বয়কট, রবীন্দ্রনাথ ও কিছু প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন

অভিমুন্য গুহ

সম্প্রতি লাদাখ সীমান্তে চীনা সেনাদের বর্বরোচিত আক্রমণে ২০ ভারতীয় জওয়ানের মৃত্যু এবং ভারতের প্রত্যাঘাতে অন্তত ৪৫ চীনা সেনার মৃত্যুর প্রেক্ষিতে দেশজুড়ে চীনাপণ্য বয়কটের দাবি উঠেছে। আর সেই প্রেক্ষাপটেই মূলত বামপন্থীরা অর্থাৎ কমিউনিস্টরা, চীন যাদের ধাত্রীভূমি, তাদের তরফ থেকে কিছু তির্যক প্রশ্ন উঠে এসেছে। যাঁরা কমিউনিস্ট পাঠশালায় পড়েননি, তাঁরা এই প্রচারে রীতিমতো বিভ্রান্তবোধ করছেন। এমনকী যাঁদের দেশের প্রতি ভালোবাসার কমতি নেই তাঁরাও এই প্রচারের ফলে সন্দিহান হয়ে পড়েছেন, আদৌ চীনাপণ্য বয়কট করা সম্ভব হবে তো কিংবা বয়কট করলেও তার পরিণাম ভেবে তাঁরা আশঙ্কিত। আশঙ্কার বাস্তবিক কারণ রয়েছে। কারণ চীনাপণ্য ভারতের বাজার ছেয়ে ফেলেছে। পেটিএমের মতো আর্থিক অ্যাপেও তাদের বিপুল লগ্নি রয়েছে। এই অবস্থায় তাদের বয়কটের সিদ্ধান্ত কি আদৌ ফলপ্রসূ হবে? উত্তর খোঁজা যাক।

অনেকে এই চীনাপণ্য বয়কটের পরিপ্রেক্ষিতে রবীন্দ্রনাথের দোহাই দিচ্ছেন। বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে রবীন্দ্রনাথ স্বদেশি পণ্য ব্যবহার ও বিদেশি পণ্য বয়কটের পক্ষপাতী ছিলেন। তারপর এই আন্দোলন চলাকালীনই তাঁর অবস্থানের বদল ঘটে। বলাই বাহুল্য, এই ধরনের প্রচার আসলে অর্ধসত্য, ভাবের ঘরে চুরি। রবীন্দ্রনাথ তাঁর মতাদর্শ বদল করেননি। স্বদেশি পণ্যের ওপরই তাঁর আস্থা ছিল। তিনি দেখেছিলেন স্বদেশি উন্মত্ততায় বিদেশি দ্রব্য পোড়াতে গিয়ে লোকসান হচ্ছে এদেশীয় ব্যবসায়ীদেরও। এতে রবীন্দ্রনাথ মনে আঘাত পান। তাঁর যুক্তি ছিল, আমাদের লড়াই বিদেশিদের তৈরি বিদেশি পণ্যের বিরুদ্ধে। এদেশের মানুষকে ভাতে মারলে আমাদের কোনো উদ্দেশ্য সাধিত হবে না।

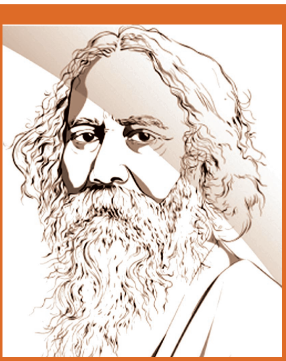

রবীন্দ্রনাথ জানতেন না, শতবর্ষ পরে অর্থনীতির এই পরিস্থিতি দাঁড়াবে। শুধু তিনি কেন, সেই সময় তাবড় অর্থনীতিবিদদের পক্ষেও টাইম মেশিনে চড়ে একশো বছর পরের এই অর্থনৈতিক চালচিত্রটা অনুমান করা সম্ভব ছিল না। কিন্তু দূরদৃষ্টি দিয়ে তিনি বুঝেছিলেন, একদিন পৃথিবীর অর্থনীতির চালিকাশক্তি হবে মানুষ, কোনো সরকার নয়।

এই দৃষ্টিকোণ থেকেই তিনি স্বদেশি আন্দোলন থেকে তথাকথিতভাবে সরে আসেন। সমসাময়িক বিভিন্ন উপন্যাসে বিশেষ করে ঘরে-বাইরে-তে তাঁর এই মনোভাবই ব্যক্ত হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ কতটা দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ছিলেন, এই ঘটনা তাঁর প্রমাণ। মনে রাখতে হবে, রবীন্দ্রনাথ যখন তাঁর এই মনোভাবের পরিচয় দিচ্ছেন, তখন দেশটা পরাধীন। দু' দুটো বিশ্বযুদ্ধের একটিও তখনও পর্যন্ত সংঘটিত হয়নি। ঔপনিবেশিকতাবাদ তখন পুরোপুরি কায়েম। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে লিগ অব নেশনস গঠিত হয়। আজ যেমন রাষ্ট্রসঙ্ঘ (ইউনাইটেড নেশনস) রয়েছে, তেমনি সুবিচারের আশায় প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর পরিস্থিতিতে লিগ অব নেশনস কাজ করেছিল, যদিও এর উদ্দেশ্য সার্বিকভাবে ব্যর্থ হয়েছিল, তারই ফলশ্রুতিতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। যাইহোক, ঔপনিবেশিকতার অত্যাচার বিশ্বের দরবারে জানাবার করবার কোনো মাধ্যম তখনও পর্যন্ত ছিল না, অন্তত স্বদেশি আন্দোলনের ঊষাপর্বে। দূরদৃষ্টিসম্পন্ন রবীন্দ্রনাথ কোনো সাময়িক উত্তেজনার বশে দেশীয় ব্যবসায়ীর ক্ষতিসাধন চাননি। ভাবলে অবাক লাগে, সেই সময় মুক্তবাণিজ্য, বিশ্ব অর্থনীতি এই ধারণাগুলোর সঙ্গে আমরা পরিচিত ছিলাম না। কিন্তু একশো বছর পর বিশ্ব অর্থনীতির গতি-প্রকৃতি কোন দিকে যাবে সেই মুহূর্তে বোঝা সম্ভব না হলেও রবীন্দ্রনাথের পদক্ষেপ আজ শতবর্ষ পরেও কতটা প্রাসঙ্গিক তা বেশ বোঝা যাচ্ছে।

একশো বছর পরে অর্থনীতির চালচিত্রটা আমূল পাল্টে গেছে। একদিকে মুক্ত অর্থনীতি, অন্যদিকে আর্থিক সংস্থাগুলির

ওপর সরকারি নিয়ন্ত্রণ; স্বাধীন ভারতের অর্থনৈতিক ভিত্তি এখন অনেক মজবুত। বিরোধীরা যাই বলুক, মোদী সরকারের আর্থিক সংস্কারে গত ছয় বছরে বিশ্বের বৃহৎ অর্থনীতির দেশগুলি যখন মন্দার বাজারে ধুঁকছে, তখন ভারতীয় অর্থনীতি সংগ্রাম করে হলেও যথেষ্ট সুদৃঢ়। এমনকী করোনাকালেও মোদী সরকারের আর্থিক প্যাকেজে ভর করে অর্থনীতির ধস অন্তত আটকানো গেছে। সর্বোপরি ভারতীয় অর্থনীতি ঘুরে দাঁড়াবার স্বপ্ন দেখছে। ইকনমিক জায়ান্টরাও কিছু এই সময় এই কাজটা করতে পারেনি।

স্বভাবতই, ভারতের বিশাল একটা বাজার রয়েছে। যে বাজারের নাগাল পাওয়ার জন্য যে কোনো বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান হাঁ-করে বসে থাকে। এটা ঠিক, যে কোনো কারণেই হোক সস্তার চীনা ইলেকট্রনিক্স পণ্য এই মুহূর্তে ভারতীয় বাজার ছেয়ে ফেলেছে। বিভিন্ন বড়ো শিপিং কোম্পানিগুলোতে চীনের প্রভূত বিনিয়োগ রয়েছে। আর্থিক লেন-দেনের অ্যাপে তাদের বিনিয়োগ রয়েছে। এককথায় চীনের অর্থনীতির ভিত্তিটাই ভারতের ওপর নির্ভরশীল। শুধু চীনাপণ্য বয়কটের ডাক দিতেই সে দেশের অর্থনীতি তথা বাণিজ্য থরহরি. কম্পমান। একটা কথা বুঝতে হবে, এখন যুদ্ধটা শুধু সমরাঙ্গনে হয় না। সেই সঙ্গে কূটনীতি, অর্থনীতি, রাজনীতি প্রতিটি ক্ষেত্রে লড়াই চলে। তারাই যুদ্ধে জয়ী হয়, যারা সামগ্রিকভাবে এই সবকটি ক্ষেত্রে জয়লাভ করবে। চীন ভারতের অর্থনীতির ওপর নির্ভরশীল, এটা আমাদের কূটনৈতিক যুদ্ধেও কয়েক কদম এগিয়ে রেখেছে। হাতেনাতে তার প্রমাণ দেখুন, রাষ্ট্রসঙ্ঘের নিরাপত্তা পরিষদের অস্থায়ী কাউন্সিলে সদস্য পদের নির্বাচনে চীন এমনকী তাদের দোসর পাকিস্তানেরও ভারতকে সমর্থন। সামরিক শক্তিতে ভারত চীনের সঙ্গে টক্কর দিতে পারে, তার প্রমাণ আমরা অকুস্থল গালওয়ানেই পেয়েছি। ১৯৬২ সালে আমরা সামরিক শক্তিতে যত না হেরেছিলাম, রাজনৈতিক নেতৃত্বের সংকট আমাদের অবস্থা আরও কাহিল করেছিল।

কেউ কেউ এমন তির্যক এমন মন্তব্যও করছেন যে, চীনাপণ্য তো চীন থেকে হেঁটে এসে আমাদের কাছে পৌঁছচ্ছে না, আমরাও কেউ চীনে যাচ্ছি না। অর্থাৎ বয়কটের রাজনৈতিক স্লোগান না তুলে চীনা পণ্য ভারতীয় বাজারে না ঢুকতে দিলেই তো পারে ভারত সরকার, তাহলে আর বয়কটের হাঙ্গামায় যেতে হয় না। বলে রাখা ভালো, অতি সম্প্রতি চীনা দ্রব্যের ওপর ভারত সরকার শুল্ক বাড়িয়েছে। এতে যেমন সরকারের আয়ও হবে, তেমনি বয়কটেরও খানিক প্রয়োজন মেটাবে। চীনাপণ্যের ওপর নির্ভরতা কমাতে কুটির শিল্পে উৎসাহ প্রদান, আর্থিক সাহায্যের প্যাকেজ সরকারের ঘোষিত নীতি। আর্থিক লেনদেন, শিপিং কোম্পানিগুলিতে চীনা বিনিয়োগ কমিয়ে ভারতীয় বিনিয়োগ বাড়াতে দ্বিতীয় মোদী সরকারের একগুচ্ছ পরিকল্পনাও নেওয়া হয়েছে। সব মিলিয়ে ভারতীয় অর্থনীতিতে চীনকে ক্রমাগত ব্রাত্য করতে মোদী সরকার বদ্ধপরিকর। কিন্তু সেটা একদিনে করতে গেলে হিতে বিপরীত হবে। আমাদের দেশের অনেক মানুষের কর্মসংস্থান হয় চীনের বিনিয়োগের সৌজন্যে। হঠাৎ করে চীনা দ্রব্য বয়কট করে দিলে এই মানুষগুলো আতান্তরে পড়বেন।

ঠিক এখানেই শতবর্ষেরও আগে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পদক্ষেপের প্রাসঙ্গিকতা। তিনি বিদেশি পণ্যের বয়কট চেয়েছিলেন, কিন্তু দেশের মানুষের ক্ষতি চাননি। আজ দেশপ্রেমের প্রয়োজনে চীনা দ্রব্যের বয়কট একান্ত অপরিহার্য, কিন্তু দেশের মানুষের আর্থিক ক্ষতি করে নয়। দেশের মানুষের এই উপলব্ধির সময় এসেছে, দেশানুগত্যের পরিচয় দিতে চীনাপণ্য বয়কটের। তবে আবেগের বশে নয়, ধীরে ধীরে সার্বিক পরিস্থিতি সুযুক্তিপূর্ণ বিবেচনার পর। এখানে সরকারের ভূমিকা গৌণ। একবিংশ শতাব্দীতে অর্থনীতির ধারণা পালটাচ্ছে। সরকারের অর্থনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করার অর্থ এই নয় যে সরকার জোর করে কিছু চাপিয়ে দেবে।

রবীন্দ্রনাথ জানতেন না, শতবর্ষ পরে অর্থনীতির এই পরিস্থিতি দাঁড়াবে। শুধু তিনি কেন, সেই সময় তাবড় অর্থনীতিবিদদের পক্ষেও টাইম মেশিনে চড়ে একশো বছর পরের এই অর্থনৈতিক চালচিত্রটা অনুমান করা সম্ভব ছিল না। কিন্তু দূরদৃষ্টি দিয়ে তিনি বুঝেছিলেন, একদিন পৃথিবীর অর্থনীতির চালিকাশক্তি হবে মানুষ, কোনো সরকার নয়। আজ চীনের হয়ে যারা এত সওয়াল করেন, তাদের জানা উচিত কমিউনিস্ট শাসকের ধর্ম মেনে, চীনে শ্রমিক, কৃষক, যারা অর্থনীতির চালিকাশক্তি তাদের কী হাল। সামাজিক ন্যায়বিচারের ন্যূনতম দাবিটুকুরও অধিকার থেকেও বঞ্চিত তারা। আগ্নেয়গিরির ওপর দাঁড়িয়ে আছে সে দেশের অর্থনীতি, যে কোনোদিন অগ্ন্যুৎপাত হবে।

সূত্রের খবর, ভারতের হাত তাদের মাথা থেকে উঠে গেলে চীনে লক্ষ লক্ষ মানুষ কাজ হারাবে। এখন তবু কমিউনিস্ট শাসকের অত্যাচার সয়েও মানুষ কোনোরকমে খেতে পরতে পারছে। সেটুকুও না জুটলে, দেওয়ালে পিঠ ঠেকে গেলে অত্যাচারী কমিউনিস্ট শাসকের মৌরুসিপাট্টার অবসান হতে বেশি দেরি হবে না। সে কারণেই সম্ভবত লাদাখ সীমান্তে আগ্রাসন নীতি। যদিও ভারতের প্রত্যাঘাতে চীনের এখন গর্ত খোঁজার পালা। স্রেফ আর্থিক বয়কটের ডাক শুনেই গেল গেল রব, করলে না জানি কী হবে। ভারতের কূটনৈতিক সাফল্যে বিশ্বের দরবারেও চীন একঘরে। তাদের শাসকরাও দেওয়াল লিখন পড়তে পারছেন; পারছেন না শুধু এদেশের হরেক কিসিমের নানা দলে মিশে থাকা জাতে কমিউনিস্টরা আর তাদের নয়া দোসর সোনিয়া মাইনো ও রাহুলের দল।

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের মুখপত্র

প্রণব

পড়ুন ও পড়ান

বাংলাদেশের জন্ম ও আওয়ামি লিগ বিরোধী চীন হঠাৎ ‘কল্পতরু’ হয়ে গেল কেন?

ঢাকা থেকে বিশেষ প্রতিনিধি॥ ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে চীন সরাসরি বাংলাদেশের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছিল। পাকিস্তানকে অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে, সামরিক কৌশল প্রণয়নে সহায়তা করে গণহত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞ চালাতে শুধু প্রত্যক্ষভাবে সাহায্যই করেনি, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও পাকিস্তানের সামরিক জান্তার পাশে দাঁড়িয়েছিল। প্রায় ৩০ লক্ষ বাঙ্গালিকে পাকিস্তানের সামরিক বাহিনী নির্বিচারে হত্যা করেছিল, চার লক্ষেরও বেশি নারী ধর্ষণ ও নির্যাতনের শিকার হয়েছিল। ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছিল গোটা দেশ। এক কোটিরও বেশি মানুষ প্রাণভয়ে আশ্রয় নিয়েছিল ভারতের মাটিতে। আর জাতিসঙ্ঘ পাকিস্তানের সঙ্গে সুর মিলিয়ে চীন বলেছিল, ‘সব মিথ্যা কথা। কোনো হত্যাকাণ্ড, নির্যাতন ও ধ্বংসের ঘটনা ঘটেনি। সব আওয়ামি লিগের অপপ্রচার’। আওয়ামি লিগ পাকিস্তানকে ধ্বংস করতে চায়। আর এতে আওয়ামি লিগকে সাহায্য করেছে ভারত। স্বাভাবিকভাবে বাংলাদেশে গণহত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞের দায় চীন কোনোভাবেই এড়াতে পারে না।

দীর্ঘ গণতান্ত্রিক সংগ্রামের ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে ভারত ছাড়া আর কোনো দেশকে পাশে পায়নি বাংলাদেশের মানুষ। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তখন রাওয়ালপিন্ডিতে পাকিস্তানি কারাগারে বন্দি। ২৫ মার্চের কালো রাতে পাকিস্তানি বর্বর সেনাবাহিনী বাঙ্গালিদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লে ২৬ মার্চের প্রথম প্রহরে বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। তারপরই তাঁকে গ্রেপ্তার করে রাওয়ালপিন্ডি নিয়ে যাওয়া হয়। ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী বাংলাদেশের ন্যায়সঙ্গত মুক্তিযুদ্ধের প্রতি বিশ্ববাসীর সমর্থন আদায় এবং বঙ্গবন্ধুর মুক্তির পক্ষে জনমত গড়তে সারাবিশ্বে দৌড়ঝাঁপ করে বিভিন্ন দেশের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে বৈঠকে মিলিত হন। অন্যদিকে ভারতের মাটিতে আশ্রয় নেওয়া বাংলাদেশের এক কোটিরও বেশি মানুষের খাওয়া-পরা ও চিকিৎসার দায়িত্ব নিতে হয় ভারতকে। ভারতবাসীকে বাড়তি করের বোঝা টানতে হয় এ কারণে। বিদেশ থেকে যে সাহায্য এসেছিল তা ছিল অত্যন্ত অপ্রতুল।

বাংলাদেশের মুক্তিবাহিনী ও ভারতের মিত্র বাহিনীর যৌথ আঘাতে পরাজিত হয়

তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী ও শেখ মুজিবুর রহমান।

পাকিস্তানি বাহিনী। ১৬ ডিসেম্বর ঢাকার সোহরাওয়ার্দি উদ্যানে যৌথ কমান্ডের অধিনায়ক লেঃ জেনারেল জগজিৎ সিংহ অরোরার কাছে আত্মসমর্পণ করে ৯৩ হাজার পাকিস্তানি সেনা। পরাজিত পাকিস্তানি অধিনায়ক লেঃ জেনারেল নিয়াজি (পাকিস্তানের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানের কাকা) অরোরার কাছে অস্ত্র সমর্পণ করে আত্মসমর্পণ দলিলে সই করেন।

স্বাধীন দেশ হিসেবে বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর পাকিস্তানি কারাগারে আটক ও মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তিদান নিয়ে যখন সারা বিশ্ব সোচ্চার হয়ে ওঠে তখনও চীন মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করতে পাকিস্তানকে মদত দেয়। কিন্তু আন্তর্জাতিক চাপের কাছে মাথা নত করে বঙ্গবন্ধুকে মুক্তি দিতে বাধ্য হয় পাকিস্তান। বঙ্গবন্ধু বেঁচে থাকা পর্যন্ত চীন বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়নি। জাতিসঙ্ঘে বাংলাদেশের সদস্যভুক্তির প্রশ্নে বার বার ভেটো দিয়েছে। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট সেনাবাহিনীর একটি অংশ বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যার অব্যবহিত পরই চীন বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়। বঙ্গবন্ধু হত্যার ষড়যন্ত্রে চীনেরও জড়িত থাকার অভিযোগ তখনই প্রচারিত হয়েছিল। বঙ্গবন্ধু হত্যার সময় তাঁর দুই মেয়ে শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানা জার্মানিতে ছিলেন। ইন্দিরা গান্ধী শেখ হাসিনাকে ভারতে নিয়ে আসেন, থাকার ব্যবস্থা করেন। দেখভালের দায়িত্বে ছিলেন প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি প্রণব কুমার মুখোপাধ্যায়। শেখ হাসিনার স্বামী পরমাণু বিজ্ঞানী ড. ওয়াজেদ মিয়ার জন্য চাকরির ব্যবস্থা করা হয়, পড়াশোনার ব্যবস্থা করা হয় ছেলে-মেয়েদের। বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর যারা বাংলাদেশের ক্ষমতা দখল করে তারা চীনের ব্যাপক সহায়তা পেতে শুরু করে। সামরিক বাহিনী মূলত চীনা অস্ত্রেই সজ্জিত হয়। শেখ হাসিনা ১৯৮১ সালে বাংলাদেশে ফিরে আসেন। একুশ বছর পর তাঁর নেতৃত্বেই আওয়ামি লিগ ক্ষমতায় আসে। কিন্তু চীন নীতি ও সমরাস্ত্রের ক্ষেত্রে জেনারেল জিয়াউর রহমান ও জেনারেল এরশাদ যে অবস্থান গ্রহণ করেন, শেখ হাসিনা তা অব্যাহত রাখেন।

সম্প্রতি যে খবরটি সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে তা হলো, বাংলাদেশকে আরও ৫ হাজার ১৬১টি পণ্য শুল্কমুক্ত রপ্তানির সুবিধা দিয়েছে চীন। এর আগে বাংলাদেশ এশিয়া-প্যাসিফিক ট্রেড এগ্রিমেন্টের (এপিটিএ) আওতায় বাংলাদেশ ৩ হাজার ৯৫টি পণ্য শুল্কমুক্ত হিসেবে রপ্তানি করতে পারত। ফলে সব মিলিয়ে ৮ হাজার ২৫৬টি পণ্য এখন বাংলাদেশ শুল্কমুক্ত হিসেবে চীনে রপ্তানি করতে পারবে। অর্থাৎ বাংলাদেশকে ৯৭ শতাংশ পর্যন্ত পণ্য শুল্ক ও কোটামুক্ত হিসেবে রপ্তানির সুবিধা দিল চীন। এ সুবিধা আগামী ১ জুলাই থেকে কার্যকর হবে। চীনের এই সুবিধাদান এমন সময়ে ঘোষিত হলো যখন লাদাখে ভারতীয় ভূখণ্ড দখলে মরিয়া হয়ে সীমান্তে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়েছে চীন। অন্যদিকে ভারতের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক উপেক্ষা করে নেপালের বাম সরকার চীনের দিকে ঝুঁকে পড়ে ভারতীয় ভূমিকে নিজের দেশের দাবি করে নতুন মানচিত্র তৈরি করেছে। যা সংসদে পাশ করিয়ে নেওয়া হয়েছে। সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়েছে ভারত সীমান্তেও। পশ্চিম সীমান্তে কাশ্মীরে পাকিস্তানি হামলা আরও গতি পেয়েছে। সংবাদমাধ্যম বলছে, এই প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশকে আরও কাছে টানার জন্যে শুল্কমুক্ত রপ্তানির সুবিধা আকস্মিকভাবে ঘোষিত হলো, যদিও বাংলাদেশ এ ব্যাপারে অনুরোধ জানিয়েছিল বহু আগে।

জুনের প্রথম সপ্তাহ থেকে উত্তপ্ত লাদাখ সীমান্ত। আর চীনের সিদ্ধান্ত এল ১৯ জুন। ঢাকায় বাণিজ্য মন্ত্রণালয় থেকে পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়ে আশা প্রকাশ করা হয়েছে। এই সুবিধা পাওয়ায় চীনের রপ্তানি উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বাড়বে এবং দুই দেশের বাণিজ্য বৈষম্যও কমবে। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, চীন বাংলাদেশের অন্যতম বড়ো বাণিজ্য অংশীদার। ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে চীন থেকে বাংলাদেশে আমদানির পরিমাণ ছিল প্রায় ১২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। বিপরীতে বাংলাদেশের রপ্তানির পরিমাণ ছিল এক বিলিয়ন মার্কিন ডলারেরও কম। বাণিজ্য ঘাটতি ১১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। এ বাণিজ্য ঘাটতি কমিয়ে আনতে চীনে শুল্কমুক্ত পণ্য রপ্তানির সুবিধা চেয়ে আসছে বাংলাদেশ। দীর্ঘ আলোচনা ও দরকষাকষির পর এবার সে সুবিধা পাচ্ছে বাংলাদেশ।

বাংলাদেশের গণমাধ্যমে বলা হয়েছে, চীনে ৯৭ শতাংশ পণ্যে শুল্কমুক্ত সুবিধা পেতে যাচ্ছে বাংলাদেশে যেটিকে 'জিরো ট্যারিফ

বঙ্গবন্ধু ও আওয়ামি লিগের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে যে চীন বাংলাদেশের জন্মের বিরোধিতা করেছে, পাকিস্তানিদের হাতে অস্ত্র দিয়ে ৩০ লক্ষ বাঙ্গালি হত্যা, লক্ষ লক্ষ নারী নির্যাতনে সহায়তা করেছে, বঙ্গবন্ধু নিহত না হওয়া পর্যন্ত স্বীকৃতি দেয়নি, সে দেশটি পাঁচ দশকের মাথায় এসে হঠাৎ 'কল্পতরু' হয়ে গেল, বিষয়টা কেমন অস্বাভাবিক ঠেকছে না!

স্কিম' বলে অভিহিত করা হচ্ছে। জানা গেছে, এ সুবিধা নেওয়ার জন্য বাংলাদেশকে দুটি শর্ত মেনে নিতে হয়েছে। এক, বর্তমানে এশিয়া প্যাসিফিক ট্রেড এগ্রিমেন্ট (আপটা)-এর আওতায় বাংলাদেশ ৬৫ শতাংশ পণ্যে যে শুল্ক সুবিধা পাচ্ছে চীনে, আগামী ১ জুলাই থেকে নতুন সুবিধা কার্যকর হলে আপটা-র সুবিধা অকার্যকর হয়ে যাবে। দুই, আপটা-র আওতায় চীনে কোনো পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে শুল্ক সুবিধা নিতে হলে বাংলাদেশকে স্থানীয়ভাবে ৩৫ শতাংশ মূল্য সংযোজন বা 'ভ্যালু অ্যাড' করতে হতো, এখন নতুন স্কিমের আওতায় চীনে শূন্য শুল্ক সুবিধা নিতে গেলে আরও ৫ শতাংশ বেশি অর্থাৎ ৪০ শতাংশ হারে ভ্যালু অ্যাড করতে হবে। প্রশ্ন হচ্ছে, এই দুই শর্ত দিয়ে চীন যে শূন্য শুল্ক সুবিধা বা জিরো ট্যারিফ স্কিম দিল, তাতে কতটা লাভবান হবে বাংলাদেশ?

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা বলছেন, চীনের দেওয়া শর্তের উত্তরে আমরা গত বছর এক চিঠিতে বলেছিলাম, নতুন সুবিধা দিলেও আমাদের আপটা সুবিধা যেন বাতিল করা না হয়। তারা ইতিবাচক মনোভাব দেখিয়েছেন। তবে বাস্তবতা হচ্ছে, ৯৭ শতাংশ পণ্যে শূন্য শুল্ক সুবিধা কার্যকর হলে তখন আর আপটা সুবিধার প্রয়োজন হবে না। ফলে প্রথম শর্তটির কোনো কার্যকারিতা আর থাকছে না। দ্বিতীয় শর্তের ক্ষেত্রে জবাব হচ্ছে, ১০ বছর আগে বাংলাদেশের জন্য এ শর্তটি বাণিজ্যে কিছুটা ব্যাঘাত ঘটালেও এখন আর কোনো বাধা নয়। কারণ এখন দেশের তৈরি পোশাক, চামড়া, প্লাস্টিক, ওযুধ-সহ প্রধান প্রধান রপ্তানি পণ্যের শক্তিশালী ব্যাকওয়ার্ড লিংকেজ শিল্প দাঁড়িয়ে গেছে। বেশিরভাগ পণ্যে গড়ে প্রায় ৬০ থেকে ৭০ শতাংশ এমনিতেই ভ্যালু অ্যাড হয়। ফলে স্থানীয় মূল্য সংযোজন ৩৫ না ৪০ তা এখন বাংলাদেশের জন্য কোনো শর্তের মধ্যে পড়ে না। সংশ্লিষ্টদের মতে মূল কথা হচ্ছে, বর্তমানে চীনের বাজারে আপটার আওতায় ৮৩টি পণ্যে এবং বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (ডব্লিউটিও)-এর আওতায় ৪ হাজার ৭৮৮টি পণ্যে শুল্কমুক্ত সুবিধা পাচ্ছে বাংলাদেশ। এ দুটি সুবিধায় চীনের ট্যারিফ লাইনের ৬৫ শতাংশ পণ্যে শুল্ক সুবিধা পাওয়া যায়। অথচ এর মধ্যে দেশের প্রধান প্রধান রপ্তানি পণ্যগুলো অন্তর্ভুক্ত নেই। এতে চীনের বাজারে প্রচলিত এ বাণিজ্য সুবিধা বাংলাদেশের কোনো কাজে লাগছে না। এখন ঘোষিত ৯৭ শতাংশ শূন্য শুল্ক সুবিধা ১ জুলাই থেকে কার্যকর হলে সব মিলিয়ে ৮ হাজারের বেশি পণ্যে শুল্ক সুবিধা পাওয়া যাবে। নতুন সুবিধায় বাংলাদেশের তৈরি পোশাক, চামড়া-সহ ১৭টি পণ্যে শুল্ক সুবিধার জন্য অনুরোধ জানিয়েছে। এর উত্তরে চীন বলেছে, তামাক ও ভুট্টা ছাড়া বাকি ১৫টি পণ্যে শুল্ক সুবিধা দিতে তাদের আপত্তি নেই। ফলে প্রাথমিক পণ্য তালিকা বিশ্লেষণ করে মনে হচ্ছে, তৈরি পোশাক-সহ চীনে রপ্তানিযোগ্য সম্ভাবনাময় সব পণ্যই এ তালিকায় অন্তর্ভুক্ত থাকবে। সে কারণে চীনের দেওয়া নতুন শুল্ক সুবিধার প্রস্তাবটি দেশের জন্য লাভজনক বলে মনে করছে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়। উপরন্তু চীন যে সুবিধা দিতে চাচ্ছে তা কার্যকর হলে বাংলাদেশের তৈরি পোশাক রপ্তানির ক্ষেত্রে একটি স্থায়ী বাজার গড়ে উঠবে।

প্রশ্ন উঠছে, বঙ্গবন্ধু ও আওয়ামি লিগের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে যে চীন বাংলাদেশের জন্মের বিরোধিতা করেছে, পাকিস্তানিদের হাতে অস্ত্র দিয়ে ৩০ লক্ষ বাঙ্গালি হত্যা, লক্ষ লক্ষ নারী নির্যাতনে সহায়তা করেছে, বঙ্গবন্ধু নিহত না হওয়া পর্যন্ত স্বীকৃতি দেয়নি, সে দেশটি পাঁচ দশকের মাথায় এসে হঠাৎ 'কল্পতরু' হয়ে গেল, বিষয়টা কেমন অস্বাভাবিক ঠেকছে না! এটা ঠিক যে, রাজনীতিতে চির শত্রু বলে কিছু নেই। বিশ্ব পরিস্থিতিতে স্থায়ী মিত্র বলেও কিছু নেই। কিন্তু তবুও বাংলাদেশের মাটি থেকে একাত্তরের রক্তের দাগ যখন এখনো শুকোয়নি। লক্ষ লক্ষ পরিবার যখন স্বজন হারানোর ব্যথা এখনো ভুলতে পারেনি, তখন বঙ্গবন্ধু হত্যার পর থেকে চীনকে 'মিত্রের' ভূমিকায় দেখে অনেকেই সেটাকে স্বাভাবিক মনে করছেন না।

বিশ্লেষকরা বলছেন, চীন করোনায় সারা বিশ্বে প্রায় কোণঠাসা হয়ে পড়েছে। পাকিস্তান, উত্তর কোরিয়া-সহ গোটা কয়েক দেশ ছাড়া বিশ্বের সব দেশই করোনার উৎপত্তি এবং উৎপত্তির পেছনের 'উদ্দেশ্য' সম্পর্কে একমত। বেরিয়ে পড়েছে থলের বিড়াল। চীন এক ভয়ংকর অর্থনৈতিক পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে যাচ্ছে শিগগিরই। চীন থেকে অনেক দেশ বড়ো বড়ো লগ্নি সরিয়ে নিতে শুরু করেছে। তাইওয়ান, হংকং অগ্নিগর্ভ হয়ে উঠছে। তিব্বত নড়াচড়া করছে। উইঘুরে কী ঘটছে তা আর গোপন থাকছে না। দক্ষিণ চীন সাগর থেকে শুরু করে পূর্ব চীন সাগরে মার্কিন ভীতি প্রবল হচ্ছে চীনের। ভারতে মোদী সরকার কাশ্মীরের ব্যাপারে দৃঢ় পদক্ষেপ নিয়েছেন। লাদাখে রাস্তাঘাট, বিমান ক্ষেত্র তৈরি হচ্ছে। অরুণাচলে হুমকি দিয়ে কাজ হচ্ছে না। 'ওয়ান বেল্ট ওয়ান রোড' যে আশা নিয়ে শি জিনপিং এগিয়েছিলেন, সে আশা পূরণের ক্ষেত্রে দিনদিন কঠিন হয়ে দাঁড়াচ্ছে। তাদের আধিপত্যবাদী থাবা বাধা পাচ্ছে। বিশ্বে চীনের মোড়লি করার স্বপ্ন ভেঙে যেতে বসেছে।

সামরিক বাহিনীতে ছিলেন, বর্তমানে অবসর গ্রহণ করেছেন এমন কয়েকজনের সঙ্গে আলাপ করলে তারা নাম প্রকাশ না করার শর্তে জানান, চীন ক্রমশ একঘরে হয়ে পড়ছে। ভারতের অবস্থান দৃঢ় হচ্ছে। সম্প্রতি নিরাপত্তা পরিষদের অস্থায়ী সদস্যপদে ভোটাভুটি তার প্রমাণ। কাশ্মীর নিয়ে ভারতের সাংবিধানিক পদক্ষেপ শুধু পাকিস্তানকে নয় চীনকেও চিন্তাগ্রস্ত করেছে। চীন লাদাখে দীর্ঘদিন ধরে কাঠামোগত অবস্থান মজবুত করলেও গত কয়েক বছরে ভারতের রাস্তাঘাট ও বিমানক্ষেত্র নির্মাণে চীন প্রমাদ গোনে। অন্যদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ভারতের প্রতিরক্ষা চুক্তির ফলে প্রযুক্তিগত সুবিধার দিক থেকে ভারত অনেক এগিয়ে রয়েছে। চীন এই অবস্থায় প্রতিবেশীদের দিয়ে ভারতকে ঘেরাও করার চেষ্টা করছে। পাকিস্তান তো চীনের কবজায় আছে সাত দশক ধরে। সাম্প্রতিক সময়ে নেপালকে ভারতের বিরুদ্ধে দাঁড় করিয়ে দিতে সফল হয়েছে। এখন বাংলাদেশকে কাছে টানতে চাইছে।

বিশেষজ্ঞরা বলেছেন, চীনা ডুবোজাহাজ কিনেছে বাংলাদেশে, মহেশখালিতে সেগুলো রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে আছে চীনারা। চীন এখন বড়ো ঘাঁটি গাড়তে চায়। পথের কাঁটা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ভারত। করোনা যেমন চীনকে বিপদে ফেলেছে, আবার সুবিধাও দিয়েছে। বাংলাদেশে করোনা চিকিৎসক দল পাঠিয়ে বিমানবন্দরে পররাষ্ট্রমন্ত্রীর অভ্যর্থনা পেয়েছে। যা ছিল প্রচলিত প্রটোকল বিরোধী। চীন আশ্বাস দিয়েছে, করোনার ভ্যাক্সিন আবিষ্কারের দোরগোড়ায় পৌঁছে গেছে তারা। চীন ব্যবহারের পর দেশের বাইরে প্রথম এই ভ্যাক্সিন পাবে বাংলাদেশ। শুল্কমুক্ত পণ্যের ঘোষণার পরপরই ভ্যাক্সিনের ঘোষণা কল্পতরু বলে কথা! ■

অতিথি কলম

ভারতের মধ্যে ভারত বিরোধীরা

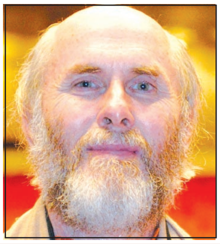

ড. ডেভিড ফ্রলে

আজকাল কিছু তথাকথিত আধুনিক ভারতীয়র মনে নেতিবাচক প্রবৃত্তি দেখা দিয়েছে। দেশের মধ্যে এই সমস্ত স্বঘোষিত অভিজাত বর্গের লোকেদের দ্বারা এক অভ্যন্তরীণ সংঘর্ষ চলছে যার মধ্যে গৃহযুদ্ধের ইঙ্গিত দেখা যাচ্ছে। এর দ্বারা দেশের সাংস্কৃতিক ধারার প্রধান প্রচেষ্টা পতনোন্মুখী হবে বা বিদেশিদের অনুকরণে প্রয়াসী হবে, যার ফলে কোনো ভারতীয় তথা হিন্দু এই ধারার সংরক্ষণ বা সংশোধন করতে সমর্থ হবে না। ভারতের এই সকল অভিজাতবর্গ ভারতের মূল পরম্পরা ও সংস্কৃতির থেকে সর্বদা আলাদা ভাবনা পোষণ করে। এই বর্গের লোকেরা ক্ষমতায় বসে পুরনো ঔপনিবেশিক শাসকদের দেশীয় অবতার রূপ ধারণ করে, নিজেরা আলাদা ছাতার তলায় বাস করে সাধারণ লোকেদের থেকে দূরত্ব বজায় রাখে, তাদের সামাজিক রীতি পালন করাকে অশ্রদ্ধা করে। ইংরেজি বলা এই বর্গ নিজভূমির পরিচয় ত্যাগ করে নিজেদের গৌরবান্বিত মনে করে।

বিশ্বে এই রকম কোনো দেশ আছে কি যেখানে রাষ্ট্রীয় স্তরে নিজস্ব সংস্কৃতি ও চিরকালীন পরম্পরাগত ইতিহাস বিকৃত করতে আনন্দিত হয়? ভারতের প্রাচীন গাথা ও পুরাতাত্ত্বিক ভগ্নাবশেষ যখন প্রমাণ সাপেক্ষে সবার সামনে উন্মোচিত হয় তখন এই লোকেরা আবিষ্কার ভেবে গৌরব বোধ না করে হাসিঠাট্টা করতে থাকে। অর্থাৎ এটাকে অসভ্য ও সামন্তবাদী পরম্পরার অঙ্গ হিসেবে কপোলকল্পনা করে। সম্ভবত, এর কারণ হলো— বিশ্বে এরকম কোনো দেশ নেই যেখানে সংখ্যাগরিষ্ঠ লোকেদের ধর্ম নিয়ে বাকিরা মজা করে— যে জনসমাজ জ্ঞানসমৃদ্ধ, চৈতন্যযুক্ত ও আধ্যাত্মিক। অপরপক্ষে অল্পসংখ্যক মতবাদীরা কট্টরপন্থী বা উগ্রবাদী হলেও বীরবিক্রমে এগিয়ে যায়। সংখ্যাগরিষ্ঠ লোক বা সংস্থার উপর যে ঋণের বোঝা থাকে বা যে আইন নির্ধারিত হয়, তা অল্পসংখ্যক লোকেদের ক্ষেত্রে কিছুটা ছাড় দেওয়া হয়। তারা ঠিকমতো আইন মানে না, দেখারও কেউ থাকে না। অল্পসংখ্যক মতের লোকেরা মাদ্রাসার মাধ্যমে নিজেদের মনমতো বিষয় পড়াতে পারে, তা সে রাষ্ট্রবিরোধী বা ব্যবহারিক দিক থেকে অনগ্রসর হলেও। অল্পসংখ্যক মতের বিরুদ্ধে কোনো পুস্তক লিখলে তা সরকারিভাবে নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়, কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠের শ্রদ্ধার কেন্দ্রকে কেউ আঘাত বা অপমান করলে কিছু যায় আসে না, বরং তীব্র প্রতিবাদের বদলে মহিমামণ্ডিতই করা হয়।

বিশ্বে দ্বিতীয় কোনো দেশ আছে কি যেখানে রাষ্ট্রের কল্যাণকে উপেক্ষা করে আঞ্চলিক, জাতিগত বা পরিবারের প্রতি নিষ্ঠাকে বড়ো করে দেখা হয়? এমনকী যারা নিজেদের গণতান্ত্রিক, সমাজবাদী বা সমাজ সংস্কারক দাবি করে তারাও এর থেকে বেরুতে পারে না। এরা রাজনৈতিক দল তৈরি করে রাষ্ট্রের কল্যাণের জন্য নয় বা কোনো রাষ্ট্রীয় বিষয়কে সামনে রেখে নয়, বরং আঞ্চলিক বা জাতিগত বিষয়কে প্রাধান্য দিয়ে। এদের প্রত্যেক গোষ্ঠী রাষ্ট্রীয় সম্পদের বড়ো অংশ ভোগ করার জন্য লালায়িত থাকে। তারা বুঝতে চায় না যে, যত বেশি তারা আদায় করে নেবে, অন্যের ভাগ ততটাই ছিনিয়ে নেওয়া হবে। জোর করে নিজের পকেট ভরলে অপরের পকেট ততটাই খালি হবে। ভারতে অসম বণ্টনের এই নিয়ম জারি রয়েছে এবং তার ফলে অসন্তোষও বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে।

অধিকাংশ আধুনিক বুদ্ধিজীবী ভারতের মতো পবিত্র ভূমির আত্মা দর্শন করেননি। এরা লোহার মিনারে নিজেদেরই অজানা মতাদর্শে বন্দি রয়েছেন।

আশ্চর্যের কথা, কিছু সম্প্রদায়ের মানুষের চাকুরিক্ষেত্রে যোগ্যতার মাপকাঠি না হয়ে অন্য কোনো মাধ্যমে প্রকট হচ্ছে। অপরপক্ষে বাকিদের উপযুক্ত যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও বিভিন্ন পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। জাতি প্রথা শেষ করতে গিয়ে এক নতুন জাতিবাদ জন্ম নিচ্ছে— যার ফলে স্কুল-কলেজে ভর্তির বা চাকুরি ক্ষেত্রে বিভিন্ন জাতের লোকেদের বিভিন্ন যোগ্যতার প্রাধান্য আছে। ব্রাহ্মণ-বিরোধী ভাবনা জাতপাতের রাজনীতি রূপে প্রচলিত রূপে সামনে এসে গেছে। জনগণের ভোটে জেতানো সরকারকে ব্যক্তিগত স্বার্থের কাজে লাগানোর চেষ্টা করছে, যাতে দেশের চেয়ে ব্যক্তিগত লাভ প্রকট হচ্ছে। ভারতের ক্ষতি করার জন্য বাহিরের লোকের প্রয়োজন নেই, ভারতীয়রাই বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে এই কাজ করছে। এতে শুধু নিজেদের নয় দেশের অগ্রগতি বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে। নিজের প্রতিবেশী পিছিয়ে পড়ছে বা দেশের অগ্রগতি বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে জেনেও এই সমস্ত লোকের কোনো মাথাব্যথা নেই। নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি করাই এদের লক্ষ্য। এই ভারতীয়রাই যখন বিদেশ যায় তখন সাধারণত ভালো সফলতা পায়, কারণ সেখানে দেশের বর্তমান পরিস্থিতি অনুযায়ী বাধা দেওয়ার কেউ থাকে না, সামাজিক ভেদভাবপূর্ণ পরিবেশের সঙ্গে সংঘর্ষ করতে হয় না।

ভারতে বেশিরভাগ রাজনৈতিক দলের লোকেরা ক্ষমতা দখলের মাধ্যমে কেবল নিজের ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স বৃদ্ধি করে ও দেশের সম্পত্তি লুঠ করে। রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যে অনেক অপরাধী, ধূর্ত, মূর্খলোক জুড়ে যায়, কারণ তারা

ক্ষমতা দখলের জন্য যে কোনো কাজ করতে পারে। এমনও দেখা যায় যে তথাকথিত উদারবাদী ও আধুনিক দলের নেতারা রাজা-প্রজা সম্পর্কের মতো ব্যবহার করে যার দ্বারা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার চেয়ে ব্যক্তিগত খবরদারি বেশি প্রাধান্য পায়। এই সব নেতা একবার ক্ষমতায় এলে জনগণের সেবা করার বদলে নিজের লাভের জন্য সবাইকে ধোঁকা দেয়। মহাভ্রষ্ট নেতার অনেক চেলা থাকে, তাই ভ্রষ্টাচারের কিছু চিহ্ন তাদের মধ্যেও দেখা যায়। নেতারা ভোটব্যাঙ্ককে সামনে রেখে সমাজের এক শ্রেণীর সঙ্গে অপর শ্রেণীর দূরত্ব বাড়িয়ে দেয় এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়কে কিছু উপহার দিয়ে নিজের ক্ষমতা টিকিয়ে রাখার রাস্তা পরিষ্কার রাখে। নেতারা নির্বাচনী অভিযানের সময় এমন ভাবে কথা বলেন যাতে রাষ্ট্রীয় সদভাব তৈরি হওয়ার পরিবর্তে শ্রেণীগত ভয় ও সন্দেহের পরিবেশ তৈরি হয়। সমাজে পরিবর্তনের দিকে লক্ষ্য রেখে বাস্তবমুখী কার্যক্রম না রেখে পরস্পরের প্রতি দ্বেষ ও ঘৃণা উৎপন্ন করে নিজেদের আখের গোছায়। এরা অশিক্ষিত জনতার মধ্যে বাস্তবিক সামাজিক সমস্যা যেমন— জনসংখ্যা বৃদ্ধি, মন্দ পরিকাঠামো, শিক্ষার অভাব ইত্যাদির জাগরণ না করে নিজস্বার্থ সিদ্ধির জন্য লোকদেখানো প্রচার করে। দেশে যখন এক সবল সরকার ক্ষমতায় আসে তখন বিরোধীদের লক্ষ্য থাকে যেভাবেই হোক সরকারকে ফেলে দিয়ে নিজেরা ক্ষমতা দখল করা। আজকাল সদর্থক ও সহযোগী বিরোধীপক্ষ প্রায় দেখা যায় না। একমাত্র লক্ষ্য— নিজে ক্ষমতায় বসা।

ভারতীয় নেতারা নিজেদের মহত্ত্বাকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য বিরোধীদের বদনাম করতে বিদেশি সংবাদমাধ্যমকেও নিজেদের সুবিধামতো ব্যবহার করতে ছাড়ে না। তাতে যদি মিথ্যা বলতে হয় বা দেশের সম্মানে আঘাত লাগে তাও স্বীকার্য। ভারতের কোনো তুচ্ছ ঘটনা বিদেশি সংবাদমাধ্যম যখন বড়ো করে দেখায়, তখন এখানের গুটিকয়েক লোক ওই সুযোগে মহা বিস্ফোটক প্রচার করে পরিবেশ দূষিত করতে ছাড়ে না। বিদেশি প্রেমের জন্য ভারতের খবরকে আরও দূষিত করে কিছুলোক নিজের দেশের সম্পর্কে বিষ উগরে দিচ্ছে। একজন খ্রিস্টান মিশনারি হত্যা হলে 'খ্রিস্টান বিরোধী হামলা' হিসেবে জাতীয় স্তরে পত্র পত্রিকায় হইহল্লা চলতে থাকে, কিন্তু শত শত হিন্দুর হত্যা হলেও সেটাকে ছোটো ঘটনা বলে আখ্যা দেওয়া হয়। ভাবটা এমন হয় যেন সাদা চামড়ার লোকের দাম বেশি। মিশনারিদের আন্দোলনকে 'সামাজিক উত্থান' রূপে পরিগণিত করা হয়।

অপরদিকে ধর্মান্তরকরণের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার চেষ্টা করলে তাকে কট্টরবাদী মনে করা হয়। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়--- লালুপ্রসাদ যাদব, মুলায়ম সিংহ যাদব প্রভৃতি নেতারা নিজেকে রাজ্যের মুকুটহীন বাদশা ভাবেন এবং নিজস্ব চাটুকারদের দ্বারা পরিবৃত থাকেন। আধুনিক কালের বহু নেতা যারা ঔপনিবেশিক শাসকেদের থেকে কোনো অংশে কম নয়, যারা নিজের দেশকেই লুঠ করছে, 'বিভেদ কর ও শাসন কর' নীতিতে চলছে, যাতে সাধারণ মানুষ এত দুর্বল হয়ে পড়ে যেন চ্যালেঞ্জ জানানোর ক্ষমতাটুকু না থাকে।

ভ্রষ্টাচার প্রায় সব জায়গায় ছেয়ে গেছে, আর সম্পর্ক প্রায় সমস্ত ক্ষেত্রে স্বার্থ পূরণের সবচেয়ে বড়ো মাধ্যমে পরিণত হয়েছে। ভারতে এক আমলাতন্ত্রের রাজত্ব চলছে, যারা রাজরোষে পড়তে চাইছে না। এজন্য তারা পরিবর্তনের বিরোধিতা করছে, বিকাশের গতি রুদ্ধ করছে।

মুখ্যরূপে, হিন্দুবহুল দেশে সবচেয়ে পুরনো কংগ্রেস পার্টি একজন ইতালীয় ক্যাথলিক মহিলাকে প্রধান দায়িত্ব দিয়ে রেখেছে। কারণ গান্ধী পরিবারের শেষ প্রধানমন্ত্রীর বিধবা পত্নী হিসেবে তিনি মশাল ধরে রেখেছেন, যেন পরিবারতন্ত্র ও তার প্রতি আনুগত্য এখনও পর্যন্ত দেশের মধ্যে রাজনৈতিক বিশ্বাসের প্রধান আধার। চিন্তার বিষয় হলো, এই সমস্ত নেতা ও দলকে প্রগতিশীল মনে করা হয়।

গত কয়েক বছরের অস্থির রাজনৈতিক কার্যকলাপের দ্বারা ভারতের পরিচয় দেওয়া যায় না। এই দেশের সভ্যতা বিশ্বের মধ্যে প্রাচীন ও শ্রেষ্ঠ সভ্যতার মধ্যে এক। এই দেশের সংস্কৃতি সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ার জন্য জিহাদের ফলে উৎপন্ন উগ্রবাদী ও কট্টরপন্থী সম্প্রদায়ের এগিয়ে আসার দরকার হয় না। এই দেশের ধর্ম ও দর্শন হলো অপার্থিব, পরমজ্ঞানী, চেতনা সৃষ্টিকারী। ভারতে সেই সমস্ত প্রধান প্রধান মত ও পথের উদ্ভব হয়েছে যা ঐতিহাসিক দিক থেকে পূর্ব এশিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছে। হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন, শিখ প্রভৃতি সহিষ্ণুতা ও আধ্যাত্মিকতার প্রতীক। এখানেই সংস্কৃত ভাষার উৎপত্তি হয়েছে, যা সারা বিশ্বের মধ্যে সমৃদ্ধ ভাষা। এখানেই যোগের মতো আধ্যাত্মিক প্রণালী, ধ্যান, স্মরণ-মনন ও আত্মজ্ঞানের পরম্পরা বিদ্যমান। বিশ্বব্যাপী আধ্যাত্মিকতার শ্রেষ্ঠতম সার্বভৌম স্বরূপ প্রাপ্ত করার উদ্দেশ্যের সঙ্গে সঙ্গে ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি কেন্দ্রিত রয়েছে ভারতবর্ষের। মজহবি কট্টরবাদীতার বিরুদ্ধে সারা বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য ভারতীয় এই মহান দর্শন ভবিষ্যতের পথনির্দেশ করবে।

বিড়ম্বনার বিষয় এই যে, এখানে মূল পুরাতন পরম্পরাকে গ্রহণ না করে আধুনিক ভারতীয় মানসিকতা মার্কসবাদের মতো পশ্চিমি মতের পদলেহন করে খুশি হয়। এমনকী খ্রিস্টান মিশনারি ও ইসলামি মোল্লা-মৌলবিদের দ্বারা কৃত উগ্রতাকে বৈধ মনে করে। অথচ এই তথাকথিত অভিজাত অর্থাৎ ভারত-বিরোধীরা ভারতে থেকেও মন্দির, সাধুসন্ত এবং মহান উৎসবের পবিত্র ধারার সঙ্গে একাত্ম অনুভব করেননি। অধিকাংশ আধুনিক বুদ্ধিজীবী ভারতের মতো পবিত্র ভূমির আত্মা দর্শন করেননি। এরা লোহার মিনারে নিজেদেরই অজানা মতাদর্শে বন্দি রয়েছেন।

(লেখক আমেরিকার নিউ মেক্সিকো ইনস্টিটিউট অব বৈদিক স্টাডিজ-এর সংস্থাপক ও যোগাচার্য)

শোক সংবাদ

কলকাতা মহানগরের স্বয়ংসেবক তথা বিশিষ্ট সামাজিক কার্যকর্তা অরুণ প্রকাশ মল্লাবতের মাতৃদেবী শান্তিদেবী মল্লাবত গত ২০ জুন পরলোকগমন করেন।

মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৪ বছর। তিনি ৪ পুত্র, ৪ পুত্রবধূ, ২ কন্যা-জামাতা ও নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন। উল্লেখ্য, শ্রীমতী শান্তিদেবী স্বর্গীয় ভঁওরলাল মল্লাবতের সহধর্মিণী। পুত্র অরুণ মল্লাবত স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের সদস্য।

পশ্চিমবঙ্গের এই বিপুলসংখ্যক পরিযায়ী শ্রমিক, তাঁদের পরিবার ও সংবেদনশীল মানুষের একটা প্রশ্ন রাজ্য সরকারের কাছে থেকেই যাবে।

পশ্চিমবঙ্গে পরিযায়ী শ্রমিকদের দুরবস্থা

ড. নারায়ণ চক্রবর্তী

'পরিযায়ী শ্রমিক' কথাটির মধ্যে পোঁ ধরা মিডিয়াকুলের দৌলতে আমাদের অনেকের ধারণা যে এরা রাজ্যের বাইরে কাজ করতে যাওয়া নিম্নবিত্ত পরিবারের শ্রমিক মাত্র। এই ধারণার বশবর্তী হয়েই জনৈকা সাংসদ সদম্ভ উক্তি করেছেন। তাঁর কথায় দম্ভের প্রকাশ তো হয়েছেই, সেইসঙ্গে উন্মোচিত হয়েছে তাঁর অশিক্ষাও।

সংজ্ঞা অনুযায়ী পরিযায়ী শ্রমিক বলতে আমরা শুধু যে স্কিল্ড ও আনস্কিল্ড লেবারদের বুঝি তা নয়; ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, অ্যাকাউন্টেন্ট থেকে ম্যানেজমেন্ট বিশেষজ্ঞরাও আছেন তালিকায়। যাঁরাই নিজভূমি থেকে বেরিয়ে অন্য জায়গায়, রাজ্যে, দেশে-বিদেশে গিয়ে কাজের বিনিময়ে উপার্জন করছেন এবং শিকড়ের টান বজায় রেখে নিজভূমিতে আবাস, কোনো কোনো ক্ষেত্রে সংসার রেখে গেছেন তারা সকলেই 'পরিযায়ী শ্রমিক' গোষ্ঠীভুক্ত। এরা এদের উপার্জনের একটা বড়ো অংশ এই রাজ্যে পাঠাচ্ছেন এবং তা রাজ্যেই ব্যয়িত হচ্ছে। এদের সকলেরই এই রাজ্যে আস্তানা আছে। রাজ্যের প্রতি এদের দায়বদ্ধতা অন্তত ওই অর্ধশিক্ষিত এমপি-র থেকে অনেক বেশি। এমপি-র সদম্ভ উক্তি 'সবাইকে জামাই আদর দেওয়া সম্ভব নয়', শুধু দাম্ভিকতার বহিঃপ্রকাশই নয়। 'বাবু যত বলে পারিষদ দলে বলে তার শতগুণ' গোছের কথায় তাঁর মালকিন আগেই সুর বেঁধে দিয়েছিলেন— পরিযায়ীদের ফেরার ট্রেনকে 'করোনা এক্সপ্রেস' নামকরণ করে। এমপি-র কথায় সেই মানসিকতা লক্ষ্য করা যায় মাত্র।

বিদেশে যেসব পরিযায়ী শ্রমিক গেছেন তাদের রেকর্ড পাসপোর্ট থেকে পাওয়া গেলেও দেশের মধ্যে যে শ্রমিকরা পরিযায়ী তাদের কোনো রেকর্ড রাখার পদ্ধতির অবর্তমানে কারোর পক্ষে বলা সম্ভব নয় যে রাজ্যে পরিযায়ী শ্রমিকের সংখ্যা কত। বিভিন্ন অনুমান ভিত্তিক গবেষণায় যা উঠে আসছে তাতে সংখ্যাটা ষাট লক্ষের উপরে, আশি লক্ষও হতে পারে। এটা শুধু পশ্চিমবঙ্গের পরিযায়ী শ্রমিকের হিসেব। অনেক টালবাহানার পরে রাজ্য সরকার মাত্র একশো ট্রেনে করে এবং কিছু বাসে ও অন্যভাবে অতি অল্প সংখ্যক শ্রমিককেই রাজ্যে ফিরিয়ে এনেছেন। এদের ফেরার কারণ বহুবিধ। সকলেই কপর্দকশূন্য হয়ে ফিরছেন তা নয়। কিন্তু এদের সঙ্গে সরকারের ব্যবহার, প্রশাসনের উদাসীনতা ও শাসকের সদম্ভ উক্তিতে প্রশাসনিক পরিস্থিতি জটিল হয়ে উঠেছে। জানা যাচ্ছে যে, কর্ণাটক সরকার পরিযায়ীদের কোয়ারান্টিনের মেয়াদ সাতদিন করেছে এবং যারা পারবেন তাদের জন্য দৈনিক তিন হাজার টাকা ব্যয়ে হোটেলের (৫০ শতাংশের বেশি ভরতুকি) ব্যবস্থা রেখেছেন। তামিলনাডু সরকারও ৫০ শতাংশ ভরতুকি রেটে হোটেলের ব্যবস্থা করেছে। পশ্চিমবঙ্গে সবাইকে কোথাও বাথরুমে, কোথাও তাঁবু খাটিয়ে, কোথাও অচল ফ্যান-সহ স্কুলবাড়িতে পরিকল্পনাহীন ভাবে রাখা হচ্ছে। এতে প্রশাসনিক ব্যর্থতাই প্রমাণিত হয়। ডিসিশন মেকিং-এর কেন্দ্রীভূত ক্ষমতাই এর কারণ বলে মনে হয়। যদিও খাবারের ব্যাপারে সব জায়গায় একই অভিযোগ মান নিয়ে। এটা এই রাজ্যের বৈশিষ্ট্য। সমস্ত স্তরে কাটমানির সগৌরব উপস্থিতিই এর প্রমাণ। দলের কাণ্ডারি নিজেই প্যানিক বোতাম টিপে দেওয়ার ফলে তলার লোকেদের দ্রুত গুছিয়ে নেওয়ার পালা শুরু হয়েছে। আজকের পশ্চিমবঙ্গে কলকারখানা প্রায় বন্ধ। কাটমানির চাপে ব্যবসা বাণিজ্য রুগ্ন। চাহিদার অভাবে প্রাইভেট শিক্ষা ব্যবস্থা শিল্পও

এ রাজ্যে রুগ্ন। নতুন বাণিজ্যের বিকাশ স্তব্ধ। নতুন হাসপাতাল ও কলেজ খোলার নামে নীল-সাদা রঙের বাড়ি হয়েছে। না আছে infrastructure না logistic support। এখানে শাসক পরামর্শকে ধৃষ্টতা মনে করে, অভিজ্ঞতা মূল্যহীন, মূল্যবান চাটুকারিতা ও আনুগত্য। এর অবিসংবাদী ফল আজকের পশ্চিমবঙ্গ। সুতরাং অল্প কিছু স্থায়ী চাকুরে ও অন্য পেশার রোজগেরে ছাড়া সমাজের একটা বড়ো অংশই পরিযায়ী শ্রমিক। মাননীয়া, আপনি এদের কর্মসংস্থাপন করতে সাহায্য করেননি। এরা বাইরে উপার্জনের বড়ো অংশ এই রাজ্যে ব্যয় করেন, সর্বোপরি এরা আপনার রাজ্যের ভোটার। সাহায্য না করুন, এদের অন্তত সম্মান করুন।

শরৎচন্দ্রের ‘শ্রীকান্ত’ উপন্যাসের দ্বিতীয় খণ্ডের কথা আমার মনে পড়ে গেল। বার্মাতে প্লেগের জন্য জাহাজে আগত সকল যাত্রীর কোয়ারেন্টাইন করার কথা সেখানে উল্লেখ করা আছে। কোয়ারেন্টাইন সেন্টারের সেই বর্ণনার ভয়াবহ চিত্রের সঙ্গে একশো বছর বাদে এই রাজ্যের কোয়ারেন্টাইন সেন্টারে কী মিল! অন্য রাজ্য সরকারগুলি অনেক আগে থেকে তৈরি হয়ে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তাদের শ্রমিকদের ফিরিয়ে নিয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী সেই সময় অযথা কালহরণ করেছেন। তারপরেও আমরা যথাযথ ব্যবস্থা না নেওয়ায় পরিচায়ী শ্রমিকদের সঙ্গে অমানুষিক আচরণ করছি। এই কি তাদের প্রাপ্য?

আর একটা কথা গভীরভাবে প্রণিধানযোগ্য। সেটা হলো মহারাষ্ট্র, বিহার, উত্তরপ্রদেশ এরকম কয়েকটি রাজ্য সরকার তাদের রাজ্যের ফিরে আসা পরিযায়ী শ্রমিকদের জন্য কর্মসংস্থান প্রকল্প তৈরি করেছে। আমাদের রাজ্যে কি তা সম্ভব? যদি একশো দিন কর্মসংস্থানের কাজে এদের আনা হয় তবে এমনিতেই চাপে থাকা এই প্রকল্প মুখ থুবড়ে পড়বে। অতঃ কিম্? জবাব কি আছে?

এই রাজ্যের পরিযায়ী শ্রমিকদের একটা বড়ো অংশ বিশেষ ভাবে শিক্ষণ প্রাপ্ত স্কিল্ড। এরা অন্য প্রদেশে আদৃত। এদের রোজগারের সমস্যা নেই। এই মুহূর্তে করোনা লকডাউনের সমস্যায় এরা একটু মানবিক ব্যবহার সরকারের কাছ থেকে আসা করতেই পারেন।

এবার একটা নতুন দিকের কথা বলব। লকডাউন পরবর্তী কাজকর্ম শুরুর প্রথম পর্যায়ের প্রস্তুতি সারা দেশ জুড়ে শুরু হয়েছে। এই অবস্থায় কিছু কিছু রাজ্য যেমন তামিলনাডু, মহারাষ্ট্র ইত্যাদি এর মধ্যেই স্কিল্ডু পার্সেন। কিন্তু যাঁরা পরিযায়ী শ্রমিক পর্যায়ভুক্ত তাঁদের জন্য উচ্চতর ইনসেনটিভ ও বিমা পরিকল্পনা ঘোষণা করেছে। গুজরাট সরকারও একই পথে হাঁটতে চলেছে। এর ফলে লকডাউন প্রক্রিয়া শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এর পরাবর্ত ক্রিয়া শুরু হবে। সেই পদ্ধতি শ্রমিক ও রাজ্য দুয়েরই মঙ্গল করবে। করোনা প্রকোপ যত স্তিমিত হবে এই পরাবর্ত ক্রিয়া তত গতি পাবে। ধীরে ধীরে দেশে অর্থনীতিও গতি পাবে।

কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের এই বিপুলসংখ্যক পরিযাযী শ্রমিক, তাঁদের পরিবার ও সংবেদশনশীল মানুষের একটা প্রশ্ন রাজ্য সরকারের কাছে রয়েই যাবে। যা সংক্ষেপে বললে দাঁড়ায়, ‘খেতে দিতে পারে না, কিল মারার গোঁসাই’। রাজ্য সরকারের অপরিণত চিন্তাপ্রসূত, ‘পরিযায়ী শ্রমিক’ সমস্যার হ্যান্ডিলিং-এর আরও উহাহরণ আছে। সেদিন টিভিতে দেখলাম, উত্তরবঙ্গের এক কোয়ারেন্টাইন সেন্টারের মানুষজনকে আঠারোদিন পরেও ছাড়া হচ্ছে না। সরকারি আধিকারিক বলছেন যে রিপোর্ট আসেনি। এ চরম অব্যবস্থা। এমনকী rt-PCR পদ্ধতিতেও অনেক কম সময়ে কোভিড-১৯-এর টেস্ট করা যায়। আবার কলকাতা কর্পোরেশনের বাথরুমে কোয়ারেন্টাইন করে রাখা লোকজন ও তাদের ক্ষোভ-বিক্ষোভ টিভিতে দেখেছি। এর ব্যাপক প্রতিক্রিয়া অবশ্যম্ভাবী। আমি তিনজন প্রবীণ নাগরিকদের কথা বলে এই লেখা শেষ করব। একজন বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী ও লেখক যিনি মুম্বাইতে আটকে গেছেন। দ্বিতীয়জনও মুম্বাইতে আটকে গেছেন, তিনি রাজ্যের এক বিরোধী দলের মিডিয়া মুখপাত্র। তৃতীয়জন চেন্নাইতে আটকে গেছেন যিনি বিশিষ্ট সাংবাদিক ও এক বাংলা দৈনিকের প্রাক্তন সম্পাদক। এরা সকলেই কলকাতায় ফিরতে খুবই আগ্রহী, কিন্তু কোয়ারেন্টাইন সেন্টারের ভয়ে ভীত। এখানে হোম-কোয়ারেন্টিনের কোনো নিয়ম নেই। প্রশাসনের ইচ্ছের ওপর নির্ভর করে। মোটের উপর, রাজ্য সরকারের ‘পরিযায়ী শ্রমিক’ সমস্যার দৃষ্টিভঙ্গি ও মোকাবিলা যথেষ্ট সমালোচনার দাবি রাখে।

(লেখক অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক; পশ্চিমবঙ্গ বায়োটেক ডেভেলপমেন্ট করপোরেশনের ভূতপূর্ব পরামর্শদাতা ও ডিরেক্টর)

চিঠিপত্র

চক্রান্ত করে নারকীয় ব্যবস্থায় নির্বাসন

অত্যন্ত বিনয় ও শ্রদ্ধার সঙ্গে জানাচ্ছি যে আমি কামারপুকুর শ্রী রামকৃষ্ণ সারদা বিদ্যামহাপীঠের সংস্কৃত বিভাগের একজন পুর্ণকালীন অধ্যাপক। বিগত ছ' বছর ধরে আমি ওই মহাবিদ্যালয় অত্যন্ত সম্মানের সঙ্গে পাঠদান করছি এবং নিজেকে নিয়ত বিদ্যার আরাধনায় নিরত রেখেছি। প্রসঙ্গত জানাচ্ছি যে, আমি একজন সঙ্ঘের স্বয়ংসেবক এবং কামারপুকুর খণ্ডের সহ-বৌদ্ধিক প্রমুখ। গত ১৮ এপ্রিল আমার সহধর্মিণীর অন্তঃসত্ত্বার কারণে আমি পুলিশ পারমিশন নিয়ে আমার পিতৃভূমি দেগঙ্গা থানা থেকে কামারপুকুরে আসি এবং স্থানীয় স্বাস্থ্যকর্মীদের নির্দেশমতো নিজেকে পরবর্তী দু'দিন পর্যন্ত হোম কোয়ারেন্টাইনে রাখি। সেই স্বাস্থকর্মীদের নির্দেশ মতো আমার পত্নীকে পার্শ্ববর্তী আমার শ্বশুরালয়ে পাঠিয়ে দিই এবং আমি সেখানে একাই থাকতে শুরু করি। কিন্তু গত ২০ এপ্রিল কিছু রাজনৈতিক নেতার ষড়যন্ত্রে আমাকে আরামবাগ হাসপাতাল পরীক্ষা করার নাম করে ইনস্টিটিউশনাল কোয়ারান্টাইনে রেখে দেওয়া হয়। সেখানকার ডাক্তারবাবু প্রথমে আমাকে হোম কোয়ারেন্টাইনে থাকার নির্দেশ দেন কিন্তু পরে রাজনৈতিক চাপে তিনি আমাকে এখানে পাঠিয়ে দেন। এখানেও চূড়ান্ত অব্যবস্থা। পায়খানার জল নেই, খোলা পায়খানা, কোনো মগ বা বালতির ব্যবস্থা নেই। তাছাড়া আমরা অনেকে এক ঘরে আছি এবং খাবার জলের ব্যবস্থা একই সঙ্গে একটি পাত্রে ফলে আমি আশঙ্কা করছি আমি সুস্থ থাকা সত্ত্বেও এখানে যখন তখন বিশ্ব মহামারী করোনা দ্বারা আক্রান্ত হয়ে যেতে পারি। এমতাবস্থায় আপনাদের পত্রিকায় মাধ্যমে বর্তমান সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি ,যাতে আর কাউকে এরকম পরিস্থিতির শিকার হতে না হয়।

—রুবেল পাল,
কামারপুকুর, হুগলী।

করোনা প্রতিরোধে আর্সেনিক এত মূল্যবান কেন

করোনা প্রতিরোধে আর্সেনিক এলবাম, ব্রায়োনিয়া এলবাম ও ক্রোটেলাস হরিডাস (এইচ) স্বীকৃতি পেয়েছে এবং শুরু হয়েছে করোনার প্রতিরোধ প্রক্রিয়া। আজকাল অনেকেই হোমিওপ্যাথির নাম শুনলেই নাক সিটকান এবং বলেন ওটা আবার চিকিৎসা নাকি! কিন্তু বর্তমানে করোনা যেভাবে থাবা বসিয়েছে তাতে আর কোনো প্যাথিতেই তেমন সাড়া মিলছে না। সারা পৃথিবী আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছে। তার মধ্যেই একটু আশার আলো জাগিয়েছে হোমিওপ্যাথি। ওই অগত্যা মধুসূদন। এখন অনেকেরই কাছে এই নাক সিটকানো হোমিওপ্যাথির নাম শোনা যাচ্ছে। কারো কারো বেশি অনুরাগ দেখা যাচ্ছে। এক্ষেত্রে একটি কথা বলা আবশ্যক, কেন আমরা হোমিওপ্যাথি নির্ধারিত এই ওষুধগুলো করেনা প্রতিরোধে অনুমোদন করব? যেমন ব্রায়োনিয়া এলবাম-৩০ যখন রোগীর নড়াচড়াতে অসুবিধা বৃদ্ধি পাবে এবং চেহারা শুস্ক দেখাবে তখন আমরা এটার দিকে এগোবো। এই ওষুধের আবার একটি চরিত্র আছে, আমাদের মাথায় রক্ত জমা হওয়ার প্রবৃত্তি। আর থাকে শুকনো কাশি, মোটকথা সবকিছুই শুকনো। এর সম্পর্ক বেশি লাং, কিডনি, হার্ট ও নার্ভের। তাই প্রথম দর্শনে দারুণ কাজ দেবে। আর্সেনিক এলবাম-৩০-এর আলোচনায়। এই ওষুধের চরিত্র, এটা প্রথমে গলনালী আক্রমণ করে। যেমন গলাব্যথা, গলা চুলকানো, শুকনো কাশি, তারপর ১৪ দিনের মধ্যে ফুসফুস আক্রমণ করে এবং ভয়াবহ হাঁপানির দিকে মানুষকে এগিয়ে নিয়ে যায়। অধ্যাপক কেন্ট তাঁর বইতে লিখেছেন ১৪ দিন তাণ্ডব চালানোর পর আবার পুনরাক্রমণ ঘটে। অবশ্য চায়নাতেও এরূপ ১৪ দিনের একটি ঘটনা আছে। তবে চায়নার থেকে এটি শ্বাসকষ্টের একটি মোক্ষণ ওষুধ। আর এতে মৃতপ্রায় দুর্বলতা। রোগীকে দেখে মনে হবে এ রোগীর আর বাঁচার কোনো আশা নেই। তাই নরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বইতে লেখা আছে— ''বাঁচানোর চাবিকাঠি ভগবানের হাতে। আমরা যাকে মনে করি এ বাঁচবে সে সবাইকে কাঁদিয়ে বিদায় নেয় আর যাকে মনে করি মরবে সে বেঁচে যায়।'' তাই হোমিওপ্যাথিতে এটাই এমনই একটা বিষাক্ত ওষুধ— 'বিষে বিষে বিষক্ষয়'। এই রোগ গলনালীতে অবস্থানকাল প্রয়োগ করলে আর ফুসফুসে যাবার সাহস দেখায় না। হোমিওপ্যাথির বিশেষত্ব এই জায়গায়। তাই বলা হয় এটা লাক্ষণিক চিকিৎসার মেডিসিন। এটা 'Treat the patient not the disease.' রোগের চিকিৎসা করে না, রোগীর লক্ষণের চিকিৎসা করে। আর ক্রোটেলাস হরিডাল শরীরে রক্ত জমাট বাঁধতে দেয় না। এটা সাপের বিষ থেকে তৈরি হয়। এটা সম্পূর্ণ লিভার, হার্ট ও নার্ভের ওষুধ। তাই হোমিওপ্যাথিতে একটি ওষুধকে লক্ষ্য করলে সমাধান সম্ভব নয়। লক্ষণ অনুসারে অন্য কিছুরও প্রয়োজন হয়। তবে এটা পূর্ব থেকে ব্যবহার করলে এই ভয়াবহ লক্ষণ মোটেই আসবে না। অর্থাৎ প্রতিরোধক হিসেবে আগে থেকে খাওয়া। তবে এটা যদি প্রতিরোধক হিসেবে গ্রহণ করা হয় অর্থাৎ যাকে বলে প্রবণতা তৈরি করা, সেটা কিন্তু দু-তিনদিন খেয়ে পুনরায় একমাস পর খেলে চলবে না। এই আর্সেনিক-৩০ গ্লোবিউলসে তৈরি করে ৪-৫ দিন মাত্রা একবড়ি করে, তারপর ৪-৫ দিন বাদে আবার শুরু। এভাবে মাসাধিককাল চালাতে হবে, তবেই প্রতিরোধের প্রবণতা জন্মাবে শরীরে। তবে এটা জানলে সবচেয়ে বেশি ভালো বোধ হবে যে, পাশ্চাত্য লেখক কেন্ট এই ওষুধের সঙ্গে করোনার ১৪ দিনের এবং শ্বাসকষ্টের একটি গভীর সম্পর্ক বের করেছেন, যেটা চিরকালীন ও শাশ্বত।

—স্বপন কুমার ভৌমিক,
শান্তিপুর, নদীয়া।

রোগ জীবাণুর হাত থেকে মুক্তির উপায়

মানুষ যদি দুর্বল হয়, তবেই তার ওপর নানা প্রকার আক্রমণ আলে। তেমনি মানুষ যদি শারীরিক দিক থেকে দুর্বল হয়, তবেই রোগ জীবাণু মানুষকে আক্রমণ করার সুযোগ পায়। জীবাণুর আক্রমণের কারণ সম্পর্কে স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, ''পাপ, দুষিত খাদ্য ও নানাবিধ অনিয়মের দ্বারা দেহ পূর্ব হইতেই যদি দুর্বল না হইয়া থাকে, তবে কোনো প্রকার জীবাণু মনুষ্যদেহ আক্রমণ করিতে পারে না। সুস্থ ব্যক্তি সর্বপ্রকার বিষাক্ত জীবাণুর মধ্যে বাস করিয়াও নিরাপদ থাকিবে।''

সুতরাং জীবাণুর আক্রমণের মূল কারণগুলি জেনে, যদি সেই কাজগুলি আমরা না করি, তবেই বিষাক্ত জীবাণুর হাত থেকে আমরা রক্ষা পেতে পারি। যে কোনো সমস্যা সমাধান করতে হলে, আন্তর্জাতিক বিবেকানন্দের বাণীকে আজ আমাদের পাথেয় করতে হবে। তাঁর আদর্শই আজ বিশ্বে শান্তি স্থাপন করতে পারে।

—**ভানু কুমার দে,**
দিনহাটা, কোচবিহার।

অপরিণত মস্তিষ্ক রাহুল গান্ধী

করোনাতঙ্কে সারা বিশ্ব বিধ্বস্ত। ভারতে লকডাউন চলছে গত মার্চ মাসের শেষ সপ্তাহ থেকে। পরিযায়ী শ্রমিকদের জীবন আরও দুর্বিষহ। মানুষ গৃহবন্দি হয়ে লড়াই করথে এই অজানা শত্রুর সঙ্গে। সারা বিশ্ব আজ জেনে ফেলেছে করোনার আঁতুরঘর চীন। এই মারণ ভাইরাসের আক্রমণে কয়েক লক্ষ মানুষ প্রাণ হরিয়েছে। বিশ্বের কাছে চীন আজ ব্রাত্য। আমেরিকরাতেই মৃত্যু সংখ্যা বেশি। এমনিতে আমেরিকার সঙ্গে চীনের ধুন্ধুমার বাণিজ্যযুদ্ধ চলছে। চীনেপ বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছে তথ্য গোপন করার। চীন নিজের ভাবমূর্তি বজায় রাকার জন্য আফ্রিকা্য তাতিন আমেরিকার দেশগুলোকে দেওয়া ঋণের সুদ মকুব করতে বাধ্য হচ্ছে। আকণ্ঠ ঋণে ডুবে থাকা চীনা অর্থনীতি ভয়াবহ বিপর্যয়ের সম্মুখীন। সংখ্যালঘু মানুষদের ওপর চীনের অত্যাচারেরহ কথা সর্বজনবিদিত। এহেন পরিস্থিতিতে চীনের সর্বময় কর্তা শি জিনপিং নিশানা করেছে ভারতকে। বিনা প্ররোচণায় লাদাখের গালওয়ান উপত্যকায় ভারতীয় জওয়ানদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে চীনের লাল ফৌজ। সংঘর্ষে একজন কর্নেল-সহ ২০ জন ভারতীয় জওয়ান প্রাণ হারিয়েছেন। ভারতীয় জওয়ানরাও সাহসের সঙ্গে তার মোকাবিলা করেছেন।

ভারতবর্ষের এরকম এক সময়ে হঠাৎ করে শীতঘুম থেকে জেগে উঠে কংগ্রেসের রাজপুত্র রাহুল গান্ধী টুইটে অভিযোগ করলেন, ' ভারতের বীর জওয়ানদের নিরস্ত্র অবস্থায় লাদাখে বিপদের মুখে ঠেলে দিয়েছে কেন্দ্র সরকার।' এসময় কোথায় নিতি ভারত সরকারের সহেগ একাত্ম হয়ে চীনের বিরুদ্ধে গর্জে উঠবেন, না তিনি সরকারের সমালোচনায় ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। এতে দেশবাসীর কাছে আবার তাঁর অপরিণত মস্তিষ্কের পরিচয় পেল।

রাহুল গান্ধীর টুইটের জবাব দিয়েছেন বিদেশ মন্ত্রী জয়শঙ্কর। তিনি বলেছেন, ১৯৯৬ ও ২০০৫ সালের দ্বিপাক্ষিক চুক্তিতেই বিবাদের সময় আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার না করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। প্রথম চুক্তিটি করা হয়েছিল দেবেগৌড়ার সময় এবং কংগ্রেস তা সমর্থন করেছিল। দ্বিতীয়টি হয়েছিল খোদ কংগ্রেস সরকারের আমলে। আসলে কংগ্রেসের রাজপুত্রের সঙ্গে চীনের সম্পর্ক অত্যন্ত সুমধুব। ২০০৮ সালে সনিয়া, রাহুল, প্রিয়ঙ্কা, রবার্ট ও তাঁদের দুই সন্তান অলিম্পিক দেকতে চীনের সরকারি অতিথি হিসেবে গিয়েছিলেন। সে সময় রাহুর গান্ধী চীনের কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে মউ স্বাক্ষর করেন।

একটু অতীতে ফিরে যাই। ১৯৬২ সালে চীন-ভারত যদ্ধের প্রকৃত সত্য জানতে নিয়োগ করা হয়েছিল এক তদন্ত কমিটি। কমিটির প্দান হেন্ডারসন ব্রুকস রিপোর্ট জমা দেন তদানীন্তল প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর কাছে। কিন্তু কোনো কে াজানা কারণে রিপোর্টটি তালাবন্ধ করে রাকা হয়। যদিও পরবর্তীকালে রাজ্যসভার সদস্য প্রবীণ সাংবাদিক কুদীপ নায়ার হেন্ডারসন রিপোর্ট প্রকাশের জন্য সংসদে সোচ্চার হয়েছিলেন। তারও পরে ১৯১০ সালের এপ্রিল মাসে ভারতের প্রতিরক্ষামন্ত্রী একে অ্যান্টনি লোকসভায় বলেছিলেন, '' হেন্ডারসন ব্রুকস রিপোর্ট কুড নট বি ডিক্লাসিফাইড বিকজ ইটস কন্টেন্টস আর এক্সট্রিমলি সেনসেটিভ।'' কিন্তু প্রশ্ন হলো, কোনো তদন্ত কমিটির রিপোর্ট কত বছর ধরে 'ক্লাসিফাইড' রাখা যায়? রাহুল গান্ধী হেন্ডারসন লরিপোর্ট প্রকাশ্যে আনার জন্য গর্জে উঠবেন কি? দেশবাসী অপেক্ষায় রইল।

—**অনু বর্মণ,**
মদনপুর, নদীয়া।

রাহুল গান্ধীর প্রপিতামহ

সন্দীপ চক্রবর্তী তাঁর নিবন্ধে (স্বস্তিকা, ২.৩.২০), বলেছেন— ''...সুতরাং রাহুল তাঁর প্রপিতামহের মতোই ভারতে ইসলামিক সন্ত্রাসের শিকড়টিকে সযত্নে আড়াল করবেন...।'' কথাটি ভুল। রাহুলের পিতামহ ফিরোজ গান্ধীর পিতৃপরিচয় বিতর্কিত। বিশ্বভারতীর প্রাক্তন উপাচার্য নিমাইসাধন বসু 'আমি : ইন্দিরা গান্ধী' পুস্তকে এলাহাবাদের এক পার্শি পরিবারের জনৈক জাহাঙ্গির ফারদুনজীকে ফিরোজের পিতা বলে উল্লেখ করেছেন। সেই সূত্রে, জাহাঙ্গির ফারদুনজী রাহুল গান্ধীর প্রপিতামহ। এর বেশি তাঁর সম্পর্কে আর কিছু জানা যায় না। তাছাড়া সন্দীপবাবু যে ইসলামিক সন্ত্রাসের কথা বলেছেন, সে সবের সূত্রপাত ভারতভাগ, তথা পাকিস্তান সৃষ্টির বেশ কিছুকাল পর থেকে। কাজেই রাহুল গান্ধী তাঁর প্রপিতামহের পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলেছেন, সে কথা কোনো ভাবেই বলা চলে না।

—**বিমলেন্দু ঘোষ,**
কলকাতা-৬০।

Amul's INDIA 3.0

BASED ON 50 YEARS OF AMUL ADVERTISING
BY daCUNHA COMMUNICATIONS

Amitabh Bachchan • Agnello Dias • Anuvab Pal • Arnab Goswami
Ayaz Memon • Bachi Karkaria • Indrajit Hazra • Jai Arjun Singh • Jayant Rane
Jug Suraiya • Karan Johar • Kiran Khalap • M.J. Akbar • Manish Jhaveri
Nana Chudasama • Naresh Fernandes • Rahul daCunha • Sachin Tendulkar
Santosh Desai • Shashi Tharoor • Shyam Benegal • Sidharth Bhatia
Sylvester daCunha • Dr V. Kurien • Vir Sanghvi • Vishal Dadlani • V.V.S. Laxman